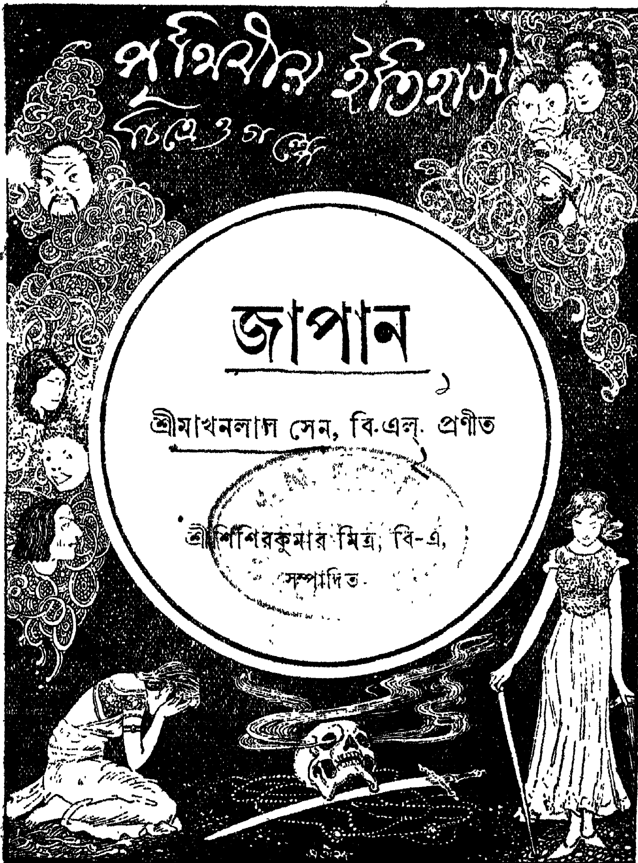

পৃথিবীর ইতিহাস
চিত্রে ও গল্পে
জাপান
শ্রীমাখনলাল সেন, বি-এল্ প্রণীত
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি-এ,
সম্পাদিত



ন্যাশনাল ভ্যারাইটি
পৃষ্ঠপোষক এইচ. এম. গান্ধি
ষ্টোর্স
খদ্দর মিল
তাঁতের কাপড়
ঢাকাই
টাঙ্গাইল
ফরাস ডাঙ্গা
শান্তিপুর
বেনারসী
প্রভৃতি
সুলভ মূল্যে
ও একদরে
বিক্রয় হয়
২২০ আপার সারকুলার রোড, শ্যাম বাজার, কলিকাতা
Sinha

উৎসর্গ

যিনি বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব,

যাঁহার নাম বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পদ,

যাঁহার 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে

ভারতের শত শতাব্দীর নিস্তব্ধ গগন

প্রথম মুখরিয়া উঠে,

সেই প্রাতঃস্মরণীয় বঙ্কিমচন্দ্রের অমর নামে

প্রাচ্য গগনের নবীন ঊষা জাপানের

স্বাধীনতার ইতিহাস উৎসর্গীকৃত হইল।

প্রকাশক—
শ্রীশিশির কুমার মিত্র, বি.এ.
শিশির পাব্‌লিশিং হাউস্‌
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

কলিকাতা—৩৩নং গৌরীবেড় লেন,
সূর্য্য প্রেসে
শ্রীসুবোধচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

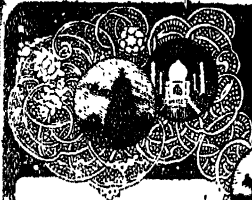
শুদ্ধিপত্র

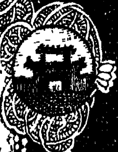
অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ
করিয়া গড়িয়া তোলে।	৪	৯	গড়িয়া তোলে।
খাইতো	৭	৭	খাইত,
শাস্ত	৭	৯	জাপানে
চাসবাস	৭	১০	চাষবাস
জাপানীদের ঠিক	৮	৭	জাপানীরা পূর্ব্বে ঠিক
লোক এই	৮	৮	লোক ছিল এই
জাতীই	৮	১৩	জাতিই
মধ্যটি	১৩	৪	মধ্যটিতে
প্রার্থনা দান।	১৩	১৭	প্রার্থনা ও দান।
দেওয়া হইত।	১৬	১৬	দেওয়া হইল।
নিয়তঃ	২১	১২	নিয়ত
তাগের	২৮	১৬	তাদের
চিত্র	৭১	৬	চিঠি


অপার

পৃথিবীর ইতিহাস







এই সিরিজের গ্রাহক আজও না হইয়া থাকিলে আপনার—ছেলে মেয়েদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

পরের পৃষ্ঠাগুলি পড়ুন





শিশির পাবলিশিং হাউস
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা



পড়ুন

কাজটা দেশের কাজ। এত বড় একটা কাজ যাতে সহানুভূতির অভাবে নিবে না যায়—তার জন্য আমি বাংলা দেশের অভিভাবক ও শিক্ষকদের নিকট আবেদন কর্‌ছি। আশা করি তাঁরা আমার এ আবেদন অগ্রাহ্য করবেন না।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

প্রত্যেক বাঙ্গালী অভিভাবক তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের জন্য এই সিরিজের গ্রাহক হউন।

১লা মাঘ ১৩২৭ সাল শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

শিশুকাল হইতে তেমনই সুগঠিত হইয়া উঠিবে, এখন হইতেই তাহারা শয়নে স্বপনে সেই চিন্তা সেই ধ্যান করিতে করিতে কালে তাহাদেরই আদর্শে নিজেদের জীবন গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

আমাদের এই শিশুপাঠ্য পৃথিবীর ইতিহাসের বিশেষত্বই এই যে ছেলেমেয়েরা এই গল্প ও ছবিগুলি আগ্রহের সহিত পড়িবে ও দেখিবে। আমরা ছেলেমেয়েদের জন্য এমন কিছু প্রকাশ করিব না, যাহা সাহিত্যের দিক দিয়া খুব উঁচুদরের হইলেও শিশুরা যাহার ত্রিসীমানাতেও ঘেঁষিতে পারে না।

যে কার্য্যে আমরা হাত দিতে যাইতেছি, তাহা এদেশের পক্ষে নূতন হইলেও ইউরোপ প্রভৃতি প্রদেশে সে-সব কিছুমাত্র নূতন নহে—এরূপ অভিনব, সুন্দর শিশুপাঠ্য পুস্তক সে সব দেশে বিস্তর বাহির হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গলা দেশের কোন প্রকাশকই আজ পর্য্যন্ত এত বড় কার্য্যে হাত দিতে সাহস করেন নাই। আমরা সংশয়চিত্তে দেশের অনেক গণ্যমান্য বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট পরামর্শ লইতে গিয়াছিলাম। তাঁহাদের অধিকাংশই আমাদের উদ্দেশ্যকে সাধুবাদ করিয়া আমাদের এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে বাঙ্গালা দেশে এত ভাল জিনিষের কদর বুঝিবার সময় এখনও আসে নাই। কিন্তু আমরা ইহাতে কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া, বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত পাঠকবর্গের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের স্থির বিশ্বাস আছে আমরা তাঁহাদের সহানুভূতি পাইব। বাঙ্গালাদেশের শিক্ষিত অভিভাবক ও শিক্ষকদের নিকট হইতে এ দাবী আমরা করিতে পারি।

গুরুতর ভার মাথায় লইয়া পৃথিবীর ইতিহাস প্রকাশ করিতে নামিলাম—ভরসা শুধু এই—যে বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায় এ ভার তাঁহাদের নিজের স্কন্ধে লইবেন। মনে রাখিবেন, এ কাজ শুধু আমার নয়;—এ দশের কাজ, দেশের কাজ, তাই এ কাজ তাঁহাদেরও। দেশের

এই যে একটা গুরুতর অভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া,—বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ নরনারীর মন হইতে অজ্ঞানতা এবং কূপমণ্ডুকতা দূর করিবার এই যে একটা মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া আমরা প্রায় সর্ব্বস্ব পণে এই "পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে" প্রকাশ করিতেছি, তাহার আবশ্যকতা বা সার্থকতা সম্বন্ধে বেশী কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। জ্ঞান সভ্যতার এই বিশ্বব্যাপী উন্নতির দিনে —যখন প্রতি দিনে, প্রতিমুহূর্ত্তে এই বিপুল পৃথিবীর প্রতি দিকটা হইতে নূতন জ্ঞানের নূতন সভ্যতার, নূতন উন্নতির স্রোত প্লাবনের বেগে আসিয়া, ভারতকে ভাসাইয়া দিতে চাহিতেছে - তখনও কি ভারত বিশ্ব সম্বন্ধে এমনি উদাসীন থাকিবে?---এখনও কি সে তাহার মনের কবাট, বুদ্ধির কবাট, জ্ঞানের কবাট রুদ্ধ করিয়া এই প্লাবনের স্রোতকে ঠেকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে? তা যদি সে করে তবে সে স্রোতে ঘর দুয়ার সমেত সেই ডুবিয়া যাইবে- স্রোত বন্ধ হইবে না। আজ বিশ্বের কত বিভিন্ন জাতি, তাহাদের জাতীয় বিশিষ্টতা, তাহাদের যুগযুগান্তরের সঞ্চিত জাতীয় ইতিহাস, রীতিনীতি, সভ্যতা,---তাহাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডার লইয়া প্রতিনিয়তই ভারতের সংস্পর্শে আসিতেছে,---আজ যদি ভারত তাহাদের সে বিশিষ্টতাগুলির সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া, তাহাদের সহিত আপোষ করিয়া না ফেলিতে পারে,---তবে ভারতের অস্তিত্ব আর বড় বেশী দিন নয়।

শুধু তাই নয়;---আমাদের জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে—সমাজের প্রতি বিভাগে যে সঙ্কীর্ণতা,—যে স্বার্থপরতা—অজ্ঞানতাপ্রসূত যে আত্মম্ভরিতা স্তূপীকৃতভাবে জমা হইয়া আছে, তাহা দূর করিতে হইলে, দেশকে এবং জাতিকে তাহার হাত হইতে উদ্ধার করিতে হইলে, আমাদের হৃদয় এবং জ্ঞান এই দুইটীরই পরিধি অত্যন্ত বাড়ান দরকার। সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই পৃথিবীর ইতিহাস প্রকাশ করা। শুধু দেশের ইতিহাস প্রকাশে এ কার্য্য সাধিত হইবে না;—out look বাড়াইতে

হইলে সারা পৃথিবীর কথাই জানিতে হইবে—আর সেই সঙ্গে জানাইতে হইবে এই বিপুল পৃথিবীর মাত্র কতটুকু অংশ জুড়িয়া পড়িয়া আছে আমাদের এই ভারত।

আজকাল বালকবালিকাদিগকে Liberal Education দিবার একটা আগ্রহ দেখা যাইতেছে,—অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন—সমাজের সঙ্কীর্ণতা দূর প্রভৃতি কথা উঠিয়াছে—কিন্তু Liberal Education হইবে কোথা হইতে?—সমাজের সঙ্কীর্ণতা যাইবে কি করিলে?—গোড়ায় যে আমাদের ঘুণ ধরিয়াছে। আমাদের জাতীয় মনটাই যে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীই যে আমাদের নিকট অত্যন্ত খাটো হইয়া গিয়াছে। কূপের মণ্ডুক বলিয়াই না আজ ভারতের জাত্যভিমানী সম্প্রদায় আমাদিগেকে বিধাতার বিশিষ্ট অনুগৃহীত মনে করিয়া ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়কে অস্পৃশ্য, পশুবৎ মনে করিতেছে! এ মোহ,—অজ্ঞানতাপ্রসূত এই আত্মম্ভরিতা আর যাহাতে ভবিষ্যৎ ভারতীয়ের মনকে কলুষিত করিতে না পারে, অন্ততঃ তাহার জন্যও পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির কথা তাহাদের জানা আবশ্যক মনে করি। শুধু জানা নয়, পৃথিবীর তুলনায় ভারতের অবস্থা যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা দরকার।

ইউরোপের বালক বাল্যকাল হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির কথা শুনিতে শুনিতে বড় হইতেছে—তাই তাহার কর্ম্মক্ষেত্র সারা পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—তাই সে চির তুষারময় মেরুপথের অভিযান খেলার স্বরূপ মনে করে,—তাই হিমালয়ের চিরহিমাবৃত তুঙ্গশৃঙ্গে উঠিবার নামে তাহার ধমনীর রক্ত আনন্দে লাফাইয়া উঠে। আর আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা? কৈশোরীদের পৃথিবী তো শুধু ভারতবর্ষ আর ইংলণ্ড লইয়া।—তাই সে বড় জোর বিলাত ঘুরিয়া আসিয়া একটা মোটা মাহিনার চাকরীর জন্য লালায়িত। এ শুধু অদৃষ্টের পরিহাস নয়;—এর জন্ম দায়ী প্রধানতঃ আমরাই। আমরাই না আমাদের বালকবালিকাদিগের নিকট পৃথিবীটাকে

এত ছোট করিয়া রাখিয়াছি। এখন সে ভুলের প্রায়শ্চিত্তের সময় আসিয়াছে। উপযুক্ত পুস্তক আমরা আমাদের গায়ের রক্ত জল করিয়া প্রস্তুত করিয়া দিলাম ;—এখন বাংলার অভিভাবক ও শিক্ষকদিগের কর্ত্তব্য তাঁহারা সম্পন্ন করুন।—বালকবালিকাদিগের হাতে বইগুলি পৌঁছিবার ভার, তাঁহারা লউন।

শুধু বালকবালিকাদের হাতে পৌঁছিয়া দিয়াই যেন তাঁহারা নিশ্চিন্ত না হন। বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মীদের হাতে এক সেট করিয়া "পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে" তুলিয়া দিন। জাতীয় সঙ্কীর্ণতা, বাহির অপেক্ষা অন্দরেই বেশী—সে সঙ্কীর্ণতা দূর করাই আগে দরকার। যাঁহারা জননী, তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতা যদি দূর না হয়, তবে সন্তানের সঙ্কীর্ণতা কি প্রকারে দূর হইবে? ইতিহাস নাম শুনিয়াই ঘাবড়াইবেন না। এ শুধু নিরস তারিখ সর্ব্বস্ব ইতিহাস নয়। যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহাই গল্পের আকারে এত সরস করিয়া বলা হইয়াছে—এত সুন্দর সুন্দর চিত্র সম্বলিত করিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে যে অনেক সময় উপন্যাসের অপেক্ষাও চিত্তাকর্ষক মনে হইবে। আর তাহা ছাড়া, অজানা দেশের, কত অজানা কাহিনী—একঘেয়ে উপন্যাসের চেয়ে তাহা পড়িতে আগ্রহ আরও বেশী হওয়ারই কথা। যাঁহারা আমাদের "চিত্রে ও গল্পে" সিরিজের বিজ্ঞান, দেশবিদেশ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, অত্যন্ত জটিল বিষয়গুলিকেও নানা দিক দিয়া চিত্তাকর্ষক করিতে আমাদের যত্ন কত সাফল্য লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসেও সে চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই। কারণ এ-কথাটা আমাদের খুব ভাল করিয়াই জানা আছে যে, যাহাদের জন্য এই বইগুলি লেখা, এগুলি পড়িতে তাহাদের আগ্রহ হওয়াটাই সব চেয়ে আগে দরকার।

'পৃথিবীর ইতিহাস' বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি নানা জাতির উত্থান পতনের ইতিহাস— নানা দেশের কথা। আমরাও সেই ভাবেই

৫০ খণ্ড পৃথিবীর ইতিহাস—বাহির করিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের সে ভুল প্রথম ভাঙ্গেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি, বলেন, শুধু জাতির ইতিহাস ত পৃথিবীর ইতিহাস নয়। মানুষের কথা ছাড়াও এই পৃথিবীতে আরও কত সুন্দর সুন্দর জিনিষের কথা বলিবার আছে। এই পৃথিবীর পশু পক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যেতর জীব জন্তুর কথা, এই পৃথিবীর নানা বিচিত্র দৃশ্য—তুষার হিমগিরিশৃঙ্গ, অসীম সমুদ্র প্রভৃতি স্বভাব দৃশ্য জীবন্ত ভাষায় ছেলেদের সম্মুখে না ধরিলে পৃথিবীর ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে বিজ্ঞানের কথাও বলিতে হইবে—মানুষ নিজের বুদ্ধি বলে এই পৃথিবীকে কেমন সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে—সে কথাও ছেলেমেয়েরা আগ্রহে অধীর হইয়া শুনিবে। আমরা তাই ১০ খণ্ডে সৃষ্টি রহস্যের (Romance of Creation) কথা বলিব।

এইভাবে অসংখ্য ছবি ও গল্পের মধ্য দিয়া সারা পৃথিবীর ইতিহাসটা বাংলাভাষায় প্রকাশিত করিবার আমাদের আরও উদ্দেশ্য আছে। প্রথম, এই একমাত্র উপায়ে বাংলার বালিকা মহলে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জননীদিগের নিকট এই অত্যাবশ্যক পুস্তকের সাদর অভ্যর্থনা মেলা সম্ভব। বাংলাভাষায় রচিত না হইলে তাহা সম্ভব হইত না—আর এত বেশী চিত্তাকর্ষক (Interesting) ভাবে লেখা না হইলেও, তাহা হইত না।

বালকদিগের সম্বন্ধেও এ কথা বিশেষভাবে খাটে। বালকেরা বালিকাদের অপেক্ষা অনেক বেশী ইংরাজি শেখে বটে, কিন্তু ইংরাজিতে লেখা ৬০ খণ্ড বই হুস্ হুস্ করিয়া পড়িবার মত বয়স যখন তাহার হয় তখন সে সংসারে প্রবেশ করিবারই উদ্যোগ করে। কিন্তু ছবি ও গল্পভরা Interesting বাংলা বই ৬০ খানা সে অতি অল্প বয়সেই পড়িয়া ফেলিতে পারে,—তাহাতে কাহারও সাহায্যের দরকার নাই। অভিভাবকেরা মনে রাখিবেন যে, যে বয়সে বালক বালিকারা লুকাইয়া লুকাইয়া রাশি রাশি

বাংলা নাটক নভেলের শ্রাদ্ধ করিতে থাকে, সেই বয়সে যদি তাহারা হাতের কাছে একসেট করিয়া "পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে" পায়,—তবে তাহা পড়িয়া উঠিতে শুধু যে তাহাদের বেশী সময় লাগিবে না, তাহা নহে ;—তাহার শিক্ষা ও চরিত্রের ধারা ভিন্ন পথে গিয়া, তাহাদিগকে নূতন জীবনে সঞ্জীবিত করিবে। হাতের কাছে এই চিত্তাকর্ষক গল্পময় ইতিহাস পাইলে অনেকেই আর বাজে উপন্যাস সংগ্রহ করিবার কষ্ট স্বীকার করিবে না।

বাংলার সহৃদয় শিক্ষক সম্প্রদায়ের নিকট আমার একটি নিবেদন আছে—তাহারা যেন ছাত্রছাত্রীদের মনে এই বইগুলি পড়িবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া দেন। মনে রাখিবেন এ দেশের কাজ, আমাদের আর্থিক লাভ ইহাতে কিছুই নাই—বরং লোকসান অনেক আছে। আমরা জানি, এই ৬০ খণ্ড বই ক্লাশে text করিয়া পড়ান অসম্ভব। তাহার দরকারও নাই। শুধু ইহার মধ্য হইতে বাছিয়া, তিন চারিখানি বই text হিসাবে পড়াইলেই যথেষ্ট। বাকিগুলি যাহাতে ছাত্র ছাত্রীরা বাড়িতে পড়িয়া লয়, তাহার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করা দরকার। আবশ্যক হইলে, প্রতি স্কুল লাইব্রেরীতে কয়েক সেট করিয়া পুস্তক আনাইয়া, প্রতি ছাত্র ছাত্রীকে সেইখান হইতে পড়িবার ব্যবস্থা করাইয়া দেন, তবে অতি সহজেই ইহার বহুল প্রচার হওয়া সম্ভব।

আমাদের আশা আছে, অতঃপর এমনই সুন্দর ও চিত্তরঞ্জন করিয়া বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠরত্নগুলি শিশুদের উপহার দিব। এমনই চিত্র গল্পের মধ্য দিয়া বিজ্ঞানের কথা শিশুদের শুনাইব। আমাদের এই সকল কল্পনার সার্থকতা নির্ভর করিতেছে বাঙ্গালা দেশের পাঠকবর্গের উপর। আশা করি বাঙ্গালার প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই গ্রাহক হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত ও বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে সহায়তা করিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই বিরাট কার্য্যের জন্য আমাদিগের

অনেক আর্থিক ক্ষতি হওয়া সম্ভব। সে জন্য আমাদের শুভানুধ্যায়ী অনেক বন্ধু আমাদিগকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের কাজ ভাবিয়া,—আর্থিক ক্ষতি স্বীকারে প্রস্তুত হইয়াই আমি এই কার্য্যে নামিয়াছি। নামিয়া অবধি অনেকের আন্তরিক সহানুভূতিও আমরা পাইয়াছি; বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত প্রতিভাশালী গ্রন্থকার এবং চিত্রকর এই মহৎ ব্রত উদযাপনের জন্য অতি সামান্য মাত্র পারিশ্রমিকে প্রাণপণ শক্তিতে আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহাদিগের নিকট উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ভাষা আমার নাই। আশা আছে সর্ব্ব সাধারণের নিকট হইতেও যদি আমরা সেইরূপ সহানুভূতি পাই তবে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত আমাদিগের আর্থিক ক্ষতি নাও হইতে পারে। আর কি বলিব? জগদীশ্বর সাফল্য আনিয়া দিন। ইতি

সম্পাদক।

"পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে"

পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে

গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী।

পোষ্টেজ বাবদ ২৲ দুই টাকা পাঠাইলেই মাসিক গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয়। মাসিক গ্রাহকদের প্রতি মাসে যে কয় সংখ্যা প্রকাশিত হইবে তাহা ভি, পি, ডাকে ঐ কয়সংখ্যার মূল্য ১৲ হিসাবে ধার্য্য করিয়া পাঠান হইবে। গ্রাহকদের ভি, পি, পোষ্টেজ, প্যাকিং, মনিঅর্ডার প্রভৃতি চার্জ্জ বাবদ আর কিছু লাগিবে না। ঘরে বসিয়া পুস্তক মূল্যেই তাঁহারা বই পাইবেন। প্রতি সংখ্যা ভি, পিতে পাঠাইতে হইলে প্রায় ।৵০ অতিরিক্ত লাগে, সে ছয় আনা আমরাই দিয়া দিব। মাত্র দুই টাকা পোষ্টেজ বাবদ পাঠাইয়া (ছয়খানা বহির পোষ্টেজেই তাহা কাটিয়া যাইবে) গ্রাহকেরা ৬০ খানি বই পোষ্টেজ ফ্রিঃ পাইবেন। নিয়মিত গ্রাহকদের এত সুবিধা আজ পর্য্যন্ত আর কেহ দিতে পারেন নাই। এ সুযোগ হারাইবেন না।

আজই গ্রাহক হউন।

PLAN.

পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে

- সৃষ্টিরহস্য / ১০ খণ্ড = Romance of Creation.
- নানাজাতির ইতিহাস / ৫০ খণ্ড
  - দেশের ইতিহাস / ১৫ খণ্ড
  - বিদেশের ইতিহাস / ৩৫ খণ্ড

দেশ বিদেশ
চিত্রে ও গল্পে

উদার ও সার্ব্ব-জনীন শিক্ষা পাইতে হইলে দেশ বিদেশের সহিত ছেলেমেয়েদের পরিচয় হওয়া আবশ্যক;—শুধু গল্পের মধ্য হইতে এত সুন্দর ও সহজ ভাবে এই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে যে শুধু এই বইখানি পড়িলেই ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন জাতি ও দেশ সম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট একটা ধারণা জন্মিবে।

নানা দেশের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তত্ত্ব, নানা জাতির ইতিহাস, তাহাদের আচার ব্যবহার, রীতি, নীতি পদ্ধতি, প্রত্যেক জাতির বিশেষত্ব এই সব অতি সুন্দর সরলভাবে চিত্র ও গল্পের মধ্য দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মূল্য ১৲ টাকা।

দেশ বিদেশ চিত্রে ও গল্পে।





রাশিয়ার সহিত যুদ্ধের সময় জাপানী মেয়েরা তাহাদের বড় সাধের লম্বা বেণী কাটিয়া দিতেছে—যুদ্ধের খোরাক যোগাইবার জন্য।

এমনি অসংখ্য ছবি—সুন্দর গল্প।

আদিম জগত চিত্রে ও গল্পে—— ১৲

প্রাচীন জগত চিত্রে ও গল্পে—— ১৲

বর্ত্তমান জগত চিত্রে ও গল্পে—— ১৷৷

সারা বিশ্বের ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবে ৬০ খণ্ড বইতে। সে এক বিরাট ব্যাপার। কিন্তু ঐ ৬০ খণ্ড বই কিনিবার শক্তি কিম্বা সামর্থ্য ও সকল গুলি বই পড়িবার ধৈর্য্য অনেকেরই নাই। এক রাশ পাঠ্য পুস্তকের বোঝা মাথায় চাপাইয়া শিশুরা বাল্যকাল হইতেই অবসন্ন হইয়া পড়ে, সারা পৃথিবীর নানা জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধেও জানিবার ও পড়িবার ইচ্ছা তাহাদের আদৌ থাকে না। তাহাদেরই জন্য বিশ্বের ইতিহাস অতি সংক্ষেপে তিন খণ্ডের মধ্যে গল্প করিয়া বলা হইয়াছে। যাহারা চট্ করিয়া পৃথিবীর ইতিহাসের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পড়িয়া সে সম্বন্ধে একটা মোটা-মুটি ধারণা জন্মাইতে চাহেন, তাহাদের নিকট এই তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ ছোট্ট সংস্করণ পৃথিবীর ইতিহাসের তুলনা নাই।

তিন খণ্ডে আছে পৃথিবীর সব দেশের সব জাতির মোটামুটি সকল বিবরণ। জাতির ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝায় ইহাতে সে সমুদয়ই পাইবেন, আর পাইবেন আদীম জগতের ইতিহাস—পৃথিবীর সেই প্রথম যুগের কথা —পৃথিবীর জন্ম, মানুষের জন্ম, সভ্যতার ধীরে ধীরে মানুষের ক্রমোন্নতি। এই তিন খণ্ডই বালক বৃদ্ধ সকলেরই এক অমূল্য সম্পদ। প্রাচীন

জগতের কীর্ত্তিলেখা পড়িতে পড়িতে আপনি আনন্দে বিভোর হইবেন, আর সঙ্গে সঙ্গে পড়িবেন বর্ত্তমান জাতি সমূহের ইতিহাস, কেনই বা এক জাতি এত বড় বিশাল সাম্রাজ্য দখল করিয়া বসিয়া আছে; আবার আর এক জাতি পরাধীন হইয়া তাহারই দাসত্ব করিতেছে। প্রতি শিক্ষক প্রতি অভিভাবকদের কর্ত্তব্য এই বই তিন খানি শিশুদের কণ্ঠমণি করিয়া রাখা। শুধু গল্প ও ছবি, কোথাও আড়ষ্ট ভাব নাই, সরল প্রাঞ্জল রূপকথার মত। সুন্দর বাঁধাই, সুন্দর ছাপা।

জাপান

প্রথম পরিচ্ছেদ

আলোর দেশ

রাস্তায় আর লোক ধরে না। দুই ধারে খোলা তলোয়ার পাহারা। আর তার মধ্য দিয়া কতগুলি সৈনিক একটি লোককে হাত বাঁধিয়া লইয়া চলিয়াছে। আজ তার মৃত্যুর দিন। রাজ-দ্রোহ অপরাধে তার প্রাণদণ্ডের হুকুম হইয়াছে। কয়েদী চলিতে চলিতে জেলখানার সামনে আসিয়া একবার উপরের দিকে চাহিল। চাহিয়া দেখিল, জানালার ধারে তারই মতন একজন অপরাধী দাঁড়াইয়া আছে। বন্দী তাহাকে দেখিয়া মাথা না তুলিয়া বলিল, বন্ধুবর :—

কাঁচ হয়ে ভাঙ্গা ভাল
অটুট হয়ে থাকার চেয়ে
চালের খোলা হয়ে।

উপরকার কয়েদী সে কথার অর্থ বুঝিল। বুঝিল যে সারাজীবন কোন একটা বড় কাজ না করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাটান অপেক্ষা মহৎ কার্য্যে প্রাণ যাওয়াও ভাল। খানিক পরে উপরকার কয়েদীকে বিচারালয়ে হাজির করা হইল। বিচারকেরা তাহাকেও দোষী সাব্যস্ত করিয়া মৃত্যুর আদেশ দিলেন। অমনি সরকারের লোক তাহাকে পূর্ব্বের কয়েদীর মত বাঁধিয়া লইয়া চলিল। বন্দী দেখিল তাহার কর্ম্ম-জীবনের আজই অবসান। আর তার ভাগ্যে মাতৃভূমির সেবার সুযোগ ঘটিবে না। অথচ এখনও দেশ জাগে নাই। লোকে এখনও স্বাধীনতার মর্ম্ম বুঝে নাই। আজও রাজার নামে স্বার্থপর কর্ম্মচারীগণ প্রজার উপর অত্যাচার করিতেছে। আজও শাসনের নামে অন্যায় উৎপীড়ন চলিয়াছে। সে তখন সকলকে জ্বালাময়ী ভাষায় বুঝাইয়া দিল যে প্রাণ অপেক্ষা স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান শ্রেষ্ঠ। সে কহিল, যাহারা শাসনের নাম করিয়া কেবল দেশের ক্ষতি করে তাহারা দেশের শত্রু। দেশের যে প্রধান মন্ত্রী, দেশের

দেশের সেবা

যে প্রধান কর্ত্তা, দেশের যে প্রধান সেনাপতি সেই দেশের উন্নতির পথে প্রধান বাধা, সেই দেশের প্রধান শত্রু।

সে তখন সকলকে ডাকিয়া কহিল যে, জননী জন্মভূমির জন্য প্রত্যেক সন্তানকে জীবন পণ করিতে হইবে। জন্মভূমির গৌরব রক্ষা করিতে হইবে। তখন যাহারা তাহার মৃত্যু দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদের চক্ষে জল আসিল। তাহারা উত্তেজিত হইয়া উঠিল! বন্দী কহিতে লাগিল, বন্ধুগণ, দেখ দেশের দুর্দ্দশা। শিক্ষা নাই, শক্তি নাই। 'এই দেবতার দেশে--কিন্তু তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে বধ্যভূমি তার রক্তে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু সে দিন হইতে যেন ঐ রক্তে স্নান করিয়া তাহাদের স্বাধীনতার রবি নূতন উষার মত নূতন তেজে ফুটিয়া উঠিল। দেশের লোক এখনও ঐ দরিদ্র শিক্ষকের কথা ভুলিতে পারে নাই। আজও দলে দলে লোক তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছে। এ মোটে ষাট বছরের কথা। কোন্ দেশের জান?

গল্পে সূয্যি মামার দেশের কথা শুনিয়াছ সন্দেহ নাই।

কিন্তু তোমরা হয়তো জান না যে সত্য সত্যই এই নামের একটি দেশ আছে। এই দেশে ঊষার আলো সর্ব্ব প্রথম ফুটিয়া উঠে বলিয়া ইংরাজেরা এই আলোর দেশের নাম দিয়াছেন "Land of the Rising sun." অর্থাৎ ঊষার দেশ। যেমন নাম, দেশটি দেখিতেও তেমন সুন্দর। প্রতিদিন প্রভাতে সোণার মত ঢলঢল সূর্য্যের আলো চারিদিকে নীল জলে ঘেরা সবুজ দ্বীপটিকে যেন একটা পরীর দেশ করিয়া গড়িয়া তোলে। আর প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউগুলি সেই আলোতে গলিয়া গিয়া যেন দ্বীপটির চারিদিকে রাশি রাশি মুক্তা বর্ষণ করিতে থাকে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন তাহার চারিদিকে আলোর একটা তরঙ্গ উঠে। এই দেশের পশ্চিম দিকের লোকেরা ভাবিত ঐ দেশে দেবতারা বাস করেন তাই সে সম্বন্ধে কত সুন্দর গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। আর এই নীল সমুদ্রবেষ্টিত স্বর্ণ-রৌদ্র-স্নাত শ্যামল ভূমিখণ্ডকে দেশবাসীরা নাম দিয়াছেন জাপান বা পবিত্র ভূমি। জাপানীরা ভাবিত এদেশে পূর্ব্বে

আলোর দেশ

দেবতারাই বাস করিতেন আর তাহারা তাঁদেরই বংশধর।

ইহার পুষ্পিত শ্যামল বন, রূপার মত চক্‌চকে নদী, নীল উন্নত গিরি, বিচিত্র ঝরণা অপূর্ব্ব প্রস্রবণ-তরঙ্গ প্রহত সমুদ্র তট; আর তার উপর তুষার কিরীট—ফৈজুমীর শোভা দেখিলে দেশটাকে সত্যই যেন একটি ছবি বলিয়া মনে হয়। আবার জাপানের বাড়ী ঘর গুলিও যেন ছবির মত সাজানো। জাপানীদের নিজের দেশের উপর এত টান যে তারা এর সামান্য ঝরণাটিকেও প্রীতির চক্ষে দেখে। হিন্দুরা যেমন হিমালয়কে দেবতা জ্ঞানে পূজা করেন, জাপানীরা তেমনি ফৈজুমী পাহাড়টিকে ভক্তির চোখে দেখেন, দূর হইতে উহার রবি-রশ্মি-প্রতিফলিত তূষার-শুভ্র মুকুট দেখিলেই জাপানীরা প্রণাম করেন।

মানচিত্রে তোমরা ইংলণ্ডের মানচিত্র দেখিয়াছ সন্দেহ নাই, ঐ সঙ্গে জাপানের তুলনা করিলে অনেক বিষয়ে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিতে পাইবে। দুইটি দুই মহা প্রদেশ

ইংলণ্ড ও জাপান

হইতে পৃথক দুইটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। আর এই দুইটি দ্বীপবাসীই জগতে দুইটি পরাক্রান্ত জাতি। ব্যবসা-বাণিজ্যে এ উভয় জাতিই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইহাদের বাণিজ্যতরীর গতি বিধি। আর দুইটিই আজ সমুদ্রের রাণী। পূরবে জাপান আর পশ্চিমে বৃটন। প্রত্যেক সমুদ্রের নীল জলই ইহাদের রণতরীর সঙ্ঘাতে কাঁপিয়া উঠে। দুই জাতির ইতিহাসই শিক্ষাপ্রদ। তবে একটি জাতি সামান্য পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কি করিয়া এত বড় হইতে পারে তাহার একমাত্র দৃষ্টান্তস্থল জাপান। এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে জাপানীরা ব্যবসা-বাণিজ্যে, শৌর্য্যে-বীর্য্যে, শিল্প-চাতুর্য্যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রাচ্য দেশে এক নূতন ঊষার সৃষ্টি করিয়া তাহাদের "আলোর দেশ" এই নাম সার্থক করিয়াছে। কিন্তু একদিন জাপানীরা এ দেশে ছিল না। দেবতার দেশে তখন বুনো লোকেরা বাস করিত। এইবার সেই আগেকার কথা শোন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচীন জাপান

এই দেশে অতি পূর্ব্বে আইনো নামে একদল অসভ্য লোক বাস করিত। ইহারা সম্ভবতঃ সাইবেরিয়া দেশ হইতে তাহাদের ছোট ছোট ডিঙ্গি চড়িয়া এদেশে আসিয়াছিল। অবশ্য ইহা খৃষ্ট জন্মিবার শত শত বৎসর পূর্ব্বের কথা।

আইনোদের কথা

আইনোরা মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাস করিত, কাঁচা মাংস খাইতো, রক্ত পান করিত আর চামড়ার পোষাক পরিত। শান্ত, এখনও এদের কতক কতক বংশধর আছে। তাহারা ভীরুস্বভাব ও চাসবাস করিয়া খায়।

জাপানীরা এই আইনোদের জয় করিয়া জাপান দখল করিল। যখন দলে দলে জাপানী আসিতে আরম্ভ করিল তখন আইনোরা প্রাণভয়ে বনে আশ্রয় লইল।

জাপানীদের আগমন

কিন্তু জাপানীদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, অবশেষে তাদের

আশ্রয়টুকুও চলিয়া গেল। জাপানীরা তখন বিজয় গর্ব্বে জাপানের সর্ব্বত্র উপনিবেশ স্থাপন করিল। জাপানীদের সর্ব্বপ্রথম রাজা জীমু আইনোদের পরাস্ত করিয়া জাপানে রাজত্ব স্থাপন করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেকালের জাপানীদের সভ্যতা ও রীতি-নীতি

বংশ পরিচয়

জাপানীদের ঠিক কোনদেশের বা কোন জাতির লোক এই নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক আছে। তবে জাপানীদের মধ্যে যে মঙ্গোলীয়ান (বা চীনদের) জাতীয় লোকই বেশী সে কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে ইহাদের মধ্যে বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণী জাপানীদের মধ্যে মলয়ানবংশীয় লোকও দেখা যায়। এই দুই জাতীই জাপানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। প্রাচীনকালে এই দুই জাতির

মধ্যে অনেক ঝগড়া বিবাদ কাটাকাটি মারামারি হইয়া গিয়াছে। পরে ঐ দুই জাতি একত্রে মিশিয়া বর্ত্তমান পরাক্রান্ত জাপানজাতির সৃষ্টি হইয়াছে।

পোষাক পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্র

জাপানীরা যখন প্রথম আসিয়া এই নূতন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে তখনই তাহারা লোহার ব্যবহার জানিত। তাদের তলোয়ার, বর্শা, তীরের ফলক লৌহনির্ম্মিত ছিল। যুদ্ধের সময় তারা ধাতুনির্ম্মিত কবচ শিরস্ত্রাণ, ও বাহুবন্ধ (মণিবন্ধ) পরিত। তারা ঘোড়ায় চড়িতে জানিত। তাদের জিন, লাগাম, রেকাব সবই ছিল। জাপানীরা অলঙ্কারের মধ্যে সোণার টায়রা, রূপার হার, কাঁচের মালা, ইয়ারিং, তামা, রূপা বা পেতলের আংটি ব্যবহার করিত। জাপানীরা ভাল বুনিতে জানিত। তারা সদাসর্ব্বদা ঢিলা পায়জামা ও কোমরবন্ধ ব্যবহার করিত। তাদের বাসন পত্র ছিল পোড়ান মাটির। জাপানীরা সুরার ন্যায় একপ্রকার মাদক দ্রব্য পান করিত। তারা মৃত্যুর পরে পরলোক আছে বলিয়া বিশ্বাস করিত। আর

পিতৃপুরুষের পূজা করিত। তারা দেবদেবী মানিত বটে তবে প্রকৃত পক্ষে পৌত্তলিক ছিল না।

আজ যে জাপানী ভাষার এত বই, খবরের কাগজ, কবিতা, গল্প, দর্শনবিজ্ঞানের কথা প্রতি বৎসর ছাপান হইতেছে, তোমরা শুনিলে অবাক হইবে যে একদিন জাপানীদের নিজের ভাষা বলিয়া কোন একটি নির্দ্দিষ্ট ভাষা ছিল না। জাপানীরা যখন প্রথম জাপানে আসে তখন তাহারা লিখিতে বা পড়িতে জানিত না। তখন চীন সভ্য জাতি তাদের প্রকাণ্ড রাজত্ব। চীনদেশে তখন অনেক বড় বড় বই লেখা হইয়াছে। চীনেরা জাপানীদের প্রথম পড়িতে শেখায়। আর জাপানীরা চীনভাষা তাদের মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করে। জাপানীরা তখন আচার ব্যবহারে ধর্ম্মে কর্ম্মে পোষাক পরিচ্ছদে সকল বিষয়ে চীনের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিল। একদিন এমনিভাবে সমগ্র ইউরোপ রোম ও গ্রীসের অনুকরণ করিয়াছিল।

চীনের অনুকরণ

চীনের কাছে জাপানীরা প্রথম বংশমর্য্যাদা বা বংশ-

গরিমার কথা শিখে। তখন তাহারাও নিজেদের খুব উচ্চবংশীয় লোক বলিয়া ভাবিতে লাগিল। জাপানীরা তাই পূর্ব্বে পিতামহগণকে দেবতার বংশধর বলিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিল। এই পিতৃপুরুষ পূজা হইতে ক্রমে তাদের অনেক দেব দেবী আসিয়া জুটিল। আর ক্রমে এই সব দেব দেবীর কল্পনা হইতেই তাদের প্রাচীন জাতীয় ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়।

বংশ গৌরব

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সিণ্টু ধর্ম্ম

জাপানীরা আজকাল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অতি পূর্ব্বে তাদের এই ধর্ম্ম ছিল না। তাদের জাতীয় ধর্ম্মের নাম সিণ্টু বা কামি ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে অনেক দেব দেবীর কথা আছে।

জাপানীরা ভাবিত সাতজন স্বর্গীয় দেবতা আছেন। এরা পৃথিবীর এত ঊর্দ্ধে থাকেন যে তাঁরা পৃথিবীর কোন খবরই রাখেন না। আর এই সাতজনের নীচে পাঁচটি পার্থিব দেবতা আছেন। তাঁদের মধ্যে তেন্‌সিও-দাই-দিসিনই প্রধান। হিন্দুরা যেমন সূর্য্যকে দেবতা বলিয়া পূজা করে, জাপানীরা তেমন সূর্য্যকে জাপানের অধিষ্ঠাত্রীদেবী *বলিয়া পূজা করিত। ইনি বীর-জননী। জাপানের রাজারা ইঁহাদের বংশধর। এই তেনসিও দেবীর মন্দির এখনও জাপানের অনেক স্থানে দেখা যায়। সিণ্টু ধর্ম্ম মন্দিরের নাম 'মিয়া'। এই মন্দিরগুলি দেখিতে অদ্ভুত। তরুলতা-বেষ্টিত একটি উঁচু নির্জ্জন স্থানে এই মন্দির নির্ম্মাণ করা হইত। মন্দিরের সম্মুখে একটি বড় কাঠের বা পাথরের ফটক। তার গায়ে ছোট্ট একখানি কাঠের ফলকে যে দেবতার মন্দির তার নাম সোনার জলে লেখা। বাহির হইতে মনে

সূর্য্যদেবী ও সিণ্টু মন্দির

* আমাদের দেশে সূর্য্যকে দেবতা এবং ঊষাকে দেবী বলা হয়।

হয় যেন কত বড়ই মন্দির হইবে ; কিন্তু আসল মন্দিরটি সামান্য একটি ঘর মাত্র। দীর্ঘে,—প্রস্থে ও উচ্চে মাত্র বারো হাত। এই মন্দিরের গায়ে শিক দেওয়া ছোট একটি জানালা বসানো। মন্দিরের মধ্যটি হয় বালি, নতুবা চক্‌চকে পালিশ করা একখানা ধাতু নির্ম্মিত দর্পণ থাকে। দর্পণখানির ফ্রেম হয় মোড়ানো খড়ের. কিম্বা সাদা কাগজের তৈয়ারী। মন্দিরের পাশে একটি বড় সিন্দুক। লোকে টাকা কড়ি যা দান করে তা উহার মধ্যে থাকে। প্রায় মন্দিরের পাশেই পোষাক পরিচ্ছদ রাখিবার ছোট একখানি ঘর আছে। মূল মন্দিরের আশে পাশে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির তৈয়ার করা হইত। ঐ মন্দিরগুলি দরকার হইলে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া যায়। মন্দিরের দরজার কাছে একটি জলভরা পাত্র। উহার জলে পূজকেরা হাত মুখ ধুইয়া পবিত্র হইয়া পূজায় প্রবৃত্ত হয়। পূজার পদ্ধতি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, প্রার্থনা দান। দানে সমস্ত অপবিত্রতা দূর হয়। রক্ত মাড়ানো, মড়া ছোঁওয়া, হরিণ ছাড়া অন্য কোন চতুষ্পদ

জন্তুর মাংস খাওয়া অপবিত্র বলিয়া গণ্য হইত। প্রাণী বধ করা মহাপাপ। তীর্থে যাওয়া একটি পুণ্যের কাজ। সিণ্টুরা আমোদ-আহ্লাদপ্রিয় ছিল। মাঝে মাঝে পূজা পার্ব্বণ উপলক্ষে বহুদিন ব্যাপী আমোদ প্রমোদ, নাচ গান, ভোজ হইত। এই প্রাচীন ধর্ম্ম এখনও জাপান থেকে একেবারে লোপ পায় নাই। আজও নিম্নশ্রেণীর জাপানীদের মধ্যে অনেকের এই ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। এই ধর্ম্ম বিশ্বাসের ফলে জাপানীরা অনেকটা স্বদেশপ্রিয় হয়, কারণ তেনসিও দেবী (Tensio—Dai—Dsin) জাপানের অধিষ্টাত্রী দেবী—জাপানের শুভাশুভের কর্ত্রী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজার কথা

অতি পূর্ব্ব হইতেই জাপানীদের একজন করিয়া রাজা ছিলেন। হিন্দুদের মত জাপানীরা রাজাকে দেবতা বা দেবতার অংশ বলিয়া ভক্তি করিত। জাপানীরা এখনও খুব রাজভক্ত জাতি। জাপানীদের বিশ্বাস তাদের রাজা তেনসিও বা সূর্য্যদেবীর সন্তান। রাজার সম্বন্ধে জাপানীদের অনেক অদ্ভুত ধারণা ছিল।

রাজার দেবত্ব

জাপানীরা রাজাকে দেবতা জানিয়া তাকে মাটিতে পা ফেলিতে দিত না। তিনি একটি পোযাক দিনে দুইবার পরিতে পারিতেন না। কোন একটি পাত্র হইতে একবারের বেশী দুইবার খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিতেন না। তিনি একবার গ্রহণ করিলেই সেই পাত্রটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইত। কারণ জাপানীদের বিশ্বাস ছিল যে যদি কেহ ঐ পাত্র হইতে কোন খাদ্য দ্রব্য

গ্রহণ করে তবে তার গলা ফুলিয়া যাইবে। রাজার অনুমতি বিনা তাঁহার পরিত্যক্ত পোষাক পরিলে শারীরিক ব্যাধি জন্মিবে। শুধু ইহাই নয়। রাজ্যের মঙ্গল অমঙ্গল তাঁর উপর নির্ভর করে। তাই প্রতিদিন সকালে রাজাকে রাজ মুকুট মাথায় কয়েক ঘণ্টা চুপ করিয়া সিংহাসনে বসিয়া থাকিতে হইত। তাহাকে ঐ কয় ঘণ্টা পাথরের পুতুলের মত নিশ্চল ভাবে থাকিতে হইত। এতে রাজার খুব কষ্ট হইত সন্দেহ নাই কিন্তু তবু রাজাকে এমনি ভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইত। যদি উহার মধ্যে তাঁহার চোখ, মাথা, হাত বা অন্য কোন অঙ্গ একটু নড়িয়া উঠিত অমনি জাপানীরা রাজ্যের অমঙ্গল ভয়ে ভীত হইত। তাহারা মনে করিত যে এই সময় রাজার অঙ্গ নড়িলে দেশে যুদ্ধ, আগ্নেয় উৎপাত, মড়ক ও অন্যান্য অমঙ্গল ঘটিবে। কিছুকাল পরে রাজাকে ঐ ভাবে পুতুলের মত বসিয়া থাকিবার দায় হইতে মুক্তি দেওয়া হইত। তাঁহার পরিবর্ত্তে সিংহাসনের উপর মুকুট বসাইয়া রাখা হইত, অবশ্য কার্য্যতঃ ফল একই হইত।

রাজা একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদে বাস করিতেন। অনেক দূর হইতে তার প্রাসাদের উচ্চ চূড়া দেখা যাইত।

রাজবাড়ী

জাপানীদের আগে কোন সহর ছিল না কিন্তু যখন নগর নির্ম্মাণ হইল রাজা সহরের মাঝখানে বাস করিতেন। সহরটি চারিদিকে পরিখা ও উন্নত প্রাচীর দিয়া ঘেরা থাকিত। রাজা ঐ সুরক্ষিত সহরের মধ্যে তার বিচিত্র প্রাসাদে প্রধান রাণীকে লইয়া বাস করিতেন। আর বাকি এগারোটি রাণী আশেপাশে ছোট ছোট বাড়ীতে বাস করিতেন। রাজা সদাসর্ব্বদা দেশের গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকের দ্বারা বেষ্টিত থাকিতেন। এই সব পারিষদবর্গ নিজেদের খুব উচ্চবংশীয় লোক মনে করিয়া সাধারণ জাপানীদের ঘৃণার চোখে দেখিতেন। ইহারা প্রায়ই বিলাসী অহঙ্কারী ও অলস ছিলেন। জাপানীরা তাদের রাজাকে মিকাডো বলে। ইনি পূর্ব্বে কীওটো সহরে বাস করিতেন। এক্ষণে জাপানের বর্ত্তমান রাজধানী টোকিও সহরে থাকেন। বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদ জাপান-যাত্রীদের কাছে নিকট দেখিবার জিনিষ।

জাপানীদের প্রথম রাজার নাম জীমু। ইনি সূর্য্য-দেবীর পুত্র। ইনি আইনোদের জয় করিয়া কীওটো হইতে ইদ্‌জুমু পর্য্যন্ত শাসন করেন। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৭৫ বৎসর সুখে শান্তিতে রাজত্ব করার পর ১২৭ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ইহার পরে অনেকে রাজত্ব করেন, কিন্তু তাঁদের রাজত্বে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

রাজা জীমু

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কোরিয়া জয়

জাপানের উপরে কোরিয়া দেশ। এই দেশ লইয়া অতি পূর্ব্বকাল হইতেই জাপানের গোলমাল আরম্ভ হয়। এমন কি বিখ্যাত রুস জাপানের যুদ্ধের মূলেও এই কোরিয়াই লইয়া গোলমাল।



সম্রাজ্ঞী জিঙ্গো।

জাপান—পৃঃ ১৯।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাজ্ঞী জিঙ্গো নামে এক বীরনারী জাপানে রাজত্ব করেন। ইনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিজে উপস্থিত হইয়া সৈন্যদের উৎসাহ দিতেন। তাঁহার রাজত্ব কালে জাপানের একটি স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই সময় তাঁর স্বামীর মৃত্যু ঘটে, কিন্তু এই বীর রমণী স্বামীর মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখিয়া বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য যুদ্ধ-যাত্রা করেন, এবং পরে যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহিদের দমন করেন। কথিত আছে যে কোরিয়া জয় করিবার উদ্দেশে সম্রাজ্ঞী জিঙ্গো দৈবাদিষ্ট হয়েন।

সম্রাজ্ঞী জিঙ্গো

গল্পে আছে যে সম্রাজ্ঞী জিঙ্গো যখন কোরিয়া যাত্রা করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন তখন দেবতারা তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। সম্রাজ্ঞী তাঁর সৈন্য সামন্ত লইয়া সমুদ্র তীরে ছাউনী করিলেন। এমন সময় একদিন জল দেবতা কৌমী উপস্থিত হইয়া সম্রাজ্ঞীকে সমুদ্রের উপর দিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন। অবশেষে সম্রাজ্ঞী

যুদ্ধযাত্রা

কোরিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সমুদ্রযাত্রা করিবার কিছু পরে এক প্রকাণ্ড ঝড় উঠে। তখন সমুদ্রের বড় বড় মাছ জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সৈন্যদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার তরীগুলি বেড়িয়া থাকে। কিছু পরে ঝড় থামিয়া গেল। এইভাবে সম্রাজ্ঞী তাঁর সৈন্যসামন্ত লইয়া কোরিয়ার উপকূলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে

কোরিয়া রাজার আত্মসমর্পণ

দেখিয়া কোরিয়ার রাজা বড়ই ভয় পাইলেন। তিনি তাঁর লোকজনকে ডাকিয়া কহিলেন যে, ঐ অজেয় জাপানী সৈন্যের বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধারণ করিতে নিতান্ত অক্ষম, আর এই যুদ্ধে কোরিয়ার পরাজয় নিশ্চিত। রাজাকে এইরূপ ভীত হইতে দেখিয়া কোরিয়াবাসীরাও ভয় পাইল, তাহারা আর জাপানীদের বাধা দিতে সাহস করিল না। রাজা তাঁহার অনুচর-বর্গকে বলিলেন তাঁহাকে বন্দীর ন্যায় দুই হাত বাঁধিয়া জাপান সম্রাজ্ঞীর নিকটে লইয়া যাইতে। তাঁহার কথা-নুসারে রাজার লোক জন রাজাকে ঐ ভাবে বাঁধিয়া

সন্ধির চিহ্ন স্বরূপ সাদা নিশান তুলিয়া সম্রাজ্ঞী জিঙ্গোর কাছে লইয়া গেল। রাজা ভূমি স্পর্শ করিয়া জাপানের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এবং যতদিন না পূর্ব্ব-দিকের সূর্য্য পশ্চিমে উঠে ততদিন পর্য্যন্ত কোরিয়া জাপানের অধীন থাকিবে এই বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। সম্রাজ্ঞী সন্তুষ্ট হইয়া রাজার প্রাণ রক্ষা করিলেন এবং কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া বহু ধন রত্ন লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এই বীর রাণী ৬৯ বৎসর প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়া একশত বৎসর বয়সে প্রাণ ত্যাগ করেন।

কোরিয়ার সঙ্গে অনেক দিন হইতে অনেক বিষয়ে চীনের আদান প্রদান চলিতেছিল। নিয়ত চীনের সংশ্রবে আসিয়া কোরিয়াবাসীরা জাপানীদের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উন্নত ছিল! কোরিয়াবাসীরা তাই তাদের বিজেতা জাপানীদের অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিল। বিজেতারা বিজিতের সংশ্রবে আসিয়া অনেক বিষয়ে উন্নত ও সভ্য হইল। কোরিয়াবাসীদের নিকট হইতে

কোরিয়া জয়ের ফল

জাপান অনেক আইন কানুন আচার নীতি গ্রহণ করিল, তাহাদের শিল্প সাহিত্য জাপানীরা সম্মানের চোখে দেখিতে লাগিল। এই কোরিয়াবাসীরাই জাপানীদের প্রথম লিখিতে শেখায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শাসন প্রণালী

অতি পূর্ব্ব হইতে জাপানীরা এক একটি পরিবারে দলভুক্ত হইয়া বাস করিত। আর সেই পরিবারের কর্ত্তাই ছিল তাদের শাসনকর্ত্তা। সকলেই তাঁর বাধ্য হইয়া চলিত। এই পরিবারগুলি সময়ে ক্রমে শাখা প্রশাখা লইয়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তখন এক একটি বড় বড় কুলের সৃষ্টি হইল। আর এক এক সময়ে এক একটিপরিবার বা দল যখন খুব প্রবল হইয়া উঠিত তখন তাহারাই নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জাপানীর উপর শাসন করিত।

প্রাচীন পদ্ধতি
গৃহ-বিবাদ



সম্রাজ্ঞী জিঙ্গোর নিকটে কোরিয়া রাজের বশ্যতা স্বীকার।

জাপান—পৃঃ ২১।

জাপানীদের একজন রাজা ছিলেন বটে কিন্তু রাজশক্তির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কেবল নামে মাত্র রাজা রহিলেন। রাজা কেবল উৎসবের জন্য লোকের একটা দোহাই দেবার জন্য রহিলেন। কিন্তু প্রকৃত শাসনদণ্ড ক্রমে রাজার হস্ত হইতে এই সমস্ত প্রবল বংশগুলির হাতে পড়িল। এক একবার এক একটি করিয়া জাপানী বংশ প্রবল হইয়া উঠে আর অমনি তারা অন্যান্য জাপানীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে বহু বৎসর ধরিয়া নিয়ত যুদ্ধ বিবাদ চলিতে লাগিল। আজ একটি বংশ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে, কাল আবার আর একটি বংশ তাহাদের হাত হইতে সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লয়। ক্রমে

সামুরাই বংশের উৎপত্তি

এই গৃহ বিবাদে জাপানের শক্তি দূরে গেল। এক একবার এক একটি সম্প্রদায় প্রবল হইয়া জাপানকে স্বজাতির রক্ত-স্রোতে ভাসাইতে লাগিল। রাজা সাক্ষী গোপাল মাত্র, একটি লোক দেখানো দেবতা। এই গৃহ-বিবাদ দমন কবিবার তাঁহার কোন ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু ইহার ফলে

ক্রমে বড় বড় জমিদার বংশ ও ক্ষত্রিয় বংশের সৃষ্টি হইল। ইহারাই ক্রমে দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা ও মালিক হইয়া উঠিল।

এই সব বড় বড় বংশগুলি যখনই শক্তিশালী হইয়া উঠিত তখনই তাদের জায়গা জমি ভাগ করিয়া লইত। ইহারা তখন নিজেদের অনুচরদিগের মধ্যে অনেক জমি বিতরণ করিয়া দিতেন। যাহারা ঐ জমি ভোগ করিতেন তাহাদের বংশ পরম্পরায় পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ঐ জমিদারের পক্ষ হইয়া বা তাঁহার আদেশ অনুসারে যুদ্ধ করিতে হইত। এই ভাবে সামুরাই যোদ্ধা বা জাপানী রাজপুতদিগের সৃষ্টি হয় আর এই প্রকার শাসন প্রণালী ও ভূমি সত্বের নিয়মে জাপানে ক্রমে ভারতের ন্যায় চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইল। যাহার যাহা কাজ সেই অনুসারে জাপানীদের শ্রেণীবিভাগ করা হইল। যোদ্ধা (বা সামুরাই) কৃষি, শিল্পী ও বণিক। কিন্তু শ্রেণীবিভাগে জাতিগত কোন সমাজিক পার্থক্য ছিল না। জাত্যাংশে যোদ্ধা ও কৃষি সমান।

জাপানে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি

এই সামুরাইরা আমাদের দেশের রাজপুতদের মত সাহসী বীর ও বংশ পরম্পরায় যোদ্ধা। ইহাদের সাহস ও বীরত্ব সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে।

সামুরাইদের কথা

জাপানের বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারই সামুরাই বংশের। জাপানের বহু বড় বড় লোক এই সামুরায় সম্প্রদায়ের লোক। এখন হইতে দেখিতে পাইবে যে জাপানের ইতিহাস প্রকৃত পক্ষে সামুরাইদের ইতিহাস। ইহারাই ক্রমে জাপানের ভাগ্য বিধাতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহারা স্বভাবতঃ উদার স্বভাব ও ক্ষত্রিয়োচিত গুণে ভূষিত ছিল। এদের বংশ-মর্য্যাদা জ্ঞান ও আত্মসম্মান বোধ যথেষ্ট ছিল, তাই ইহারা সহজে কোন নীচ বা হীন কার্য্যে লিপ্ত হইত না। প্রাচীন সামুরাইএরা যে সমস্ত ক্ষত্রিয় রীতিনীতি মানিয়া চলিত সে গুলি "বোশীদো" নামে অভিহিত হইত। সামুরাইএরা সর্ব্বদাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিত,এজন্যে ইহারা সর্ব্বদাই তলোয়ার সঙ্গে রাখিত। কেহ কেহ বা দুইখানি তলোয়ার লইয়া চলা ফেরা করিত। ইহারা যুদ্ধপটু ও সাহসী ছিল বটে তবে মাঝে মাঝে যথেষ্ট নিষ্ঠুরতার

পরিচয়ও দিত। ইহাদের আচার ব্যবহারও অন্যান্য জাপানীদের হইতে অনেকটা পৃথক ছিল। একে তখনকার দিনে যোদ্ধারই সম্মান বেশী ছিল, তার উপর রাজদরবারে, শাসনকার্য্যে ইহাদের যথেষ্ট আধিপত্য ছিল এসব কারণে সামুরাইএরা জাপানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। ইহারা অনেক সময় কৃষি, শিল্পী ও বণিকদিগকে ঘৃণার চোক্ষে দেখিত। ক্রমশঃ সামুরাইএরা নিতান্ত ক্ষমতাপ্রিয় হইয়া উঠিল। পরে তোমাদের কাছে কয়েকটি বিখ্যাত সামুরাই বংশের কথা বলিব।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম

যে দিন রাজার ছেলে পরের দুঃখে নিজের রাজ্য সিংহাসন ছাড়িয়া বনে গেলেন, সেদিন সকলে স্তম্ভিত হইল। এ পর্য্যন্ত কেহ এমন অপূর্ব্ব ত্যাগ স্বীকার দেখে নাই। তারপর আবার যখন বহু বৎসর পরে তিনি লোকালয়ে ফিরিয়া আসিয়া নূতন ধর্ম্ম ও নূতন আলোকের কথা বলিলেন,তখন সকলেই ভাবিল যে ইনি মানুষ নহেন, ইনি দেবতা। দেবতা ছাড়া এমন ত্যাগ,এমন জ্ঞান আর কার? সন্ন্যাসী রাজপুত্র তখন সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, মানব

জীবনে অনন্ত দুঃখ, অনন্ত কষ্ট আছে সন্দেহ নাই কিন্তু সদাচারী হইয়া সর্ব্বদা সৎপথে থাকিলে একদিন তার এই দুঃখের নির্ব্বাণ বা শেষ হইবে। তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে মানুষ মানুষের ভাই। এ বড় ও ছোট এই লইয়া যে অহঙ্কারী, যে অজ্ঞান সেই বিবাদ করে। সৎপথে চলিতে, ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে, সকলের সমান অধিকার।

ব্রাহ্মণ চণ্ডালের মধ্যে এ বিষয়ে কোন প্রভেদ নাই। জ্ঞানে সকলের সমান অধিকার। যিনি জ্ঞানী তিনিই শ্রেষ্ঠ, যিনি সদাচারী তিনিই মহৎ। নীতি ছাড়া ধর্ম্ম নাই। কেবল কতগুলি অর্থহীন,ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম নহে! তখনকার হিন্দুরা দেব দেবীর কাছে অনেক পশু বলি দিত সেই নিষ্ঠুর প্রথায় তাঁহার কোমল প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন কতকগুলি লোক কেবলমাত্র কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া ধর্ম্মের নামে এই নিষ্ঠুর অধর্ম্মের আচরণ করিতেছে। তাই তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিলেন, যে প্রাণীমাত্রেই দয়ার পাত্র। কাহারও অনিষ্ট করিবার কাহারও প্রাণে ব্যথা

দিবার, কাহারো অধিকার নাই। সকলের সমান প্রাণ সকলের সমান বেদনা, সকলের সমান অধিকার। মানুষের মানুষকে ব্যথা দিবার বা ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গটীকেও পদ দলিত করিবার কাহারও অধিকার নাই। হিংসা করা মহা পাপ। "অহিংসা পরম ধর্ম্ম।" সকলে পুলকিত হৃদয়ে এই অপূর্ব্ব সাম্যের বাণী শুনিল। বুদ্ধের উদার তন্ত্র সকলের মর্ম্ম স্পর্শ করিল। তখন দলে দলে, রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, জ্ঞানী অজ্ঞান, সেই নির্ব্বাণের পথে ছুটিয়া আসিল। সকলে ঐ নরদেবতার পায়ে লুটাইয়া পড়িল। যে দেশে ব্রাহ্মণ শূদ্রের ছায়া মাড়াইতেন না, সে দেশে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল একতাসূত্রে বদ্ধ হইল। এই বিশ্বপ্রেমের কাছে আর কোন পার্থক্য রহিল না। ভারতের সেই এক গৌরবের যুগ।

ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে সমস্ত তিব্বতে ও চীনে ছড়াইয়া পড়ে। চীনেরা তখন এই নূতন ধর্ম্ম

প্রচার

তাদের আশে পাশের দেশ মধ্যে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ এইরূপে সমগ্র এসিয়া ভূমিখণ্ডে ভারতীয় ও চীন

প্রচারকেরা এই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিলেন। কোরিয়া-বাসীগণ চীনের কাছে এই নবধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

৫৫২ খৃষ্টাব্দে রাজদূত যখন কোরিয়া হইতে রাজস্ব লইয়া জাপানে উপস্থিত হইল তখন অন্যান্য জিনিষের মধ্যে সোণা ও তামার তৈয়ারী একটি বুদ্ধমূর্ত্তি ও কতক-গুলি বৌদ্ধশাস্ত্রও ছিল।

সম্রাটের বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ

রাজদূত সম্রাটের সম্মুখে সেই বুদ্ধমূর্ত্তি ও শাস্ত্রগুলি উপঢৌকন দিবার সময় বলিল, "যত ধর্ম্ম আছে তার মধ্যে এই ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই ধর্ম্ম বোঝা কঠিন, ব্যাখ্যা করা আরও শক্ত। এমন কি জ্ঞানী কনফুসিয়াসও * এমন জ্ঞান লাভ করেন নাই। ইহাতে অনন্ত পুণ্য—অনন্ত জ্ঞান, ও অনন্ত পুরস্কার লাভ হয়। ভাবিয়া দেখুন যে যিনিই এই অমূল্য রত্নের অধিকারী তিনি কি না করিতে পারেন। তাঁর কোন্ সাধ অপূর্ণ থাকে? এই ধর্ম্মে ভক্তের প্রত্যেক প্রার্থনা পূর্ণ হয়। একটিও নিস্ফল হয় না আর তাঁর কোন অভাবই থাকে না।"

এই কথা শুনিয়া সম্রাট আনন্দে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। উঠিয়া কহিলেন, "এ পর্য্যন্ত আমরা এমন অপূর্ব্ব ধর্ম্মের কথা শুনি নাই। পারিষদবর্গ সকলেই পুলকিত চিত্তে রাজ বাক্যের সমর্থন করিল। তখন রাজা তাঁহার পারিষদবর্গ লইয়া ঐ নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

রাজা বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাকে সহজে তাহা জাপানে প্রচার হইতে পারিল না

দৈব দুর্ঘটনা

রাজার বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার কিছুদিন পরে জাপানে মহামারী আরম্ভ হয়। এই মড়কে প্রতিদিন বহু জাপানী মরিতে লাগিল। তখন জাপানীরা ভাবিল যে তাহাদের সনাতন ধর্ম্ম ছাড়িয়া এই নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করায় দেবতারা রুষ্ট হইয়াছেন। তাহারা ভাবিল এই নূতন ধর্ম্মই অমঙ্গলের কারণ। তখন জাপানীরা সেই বুদ্ধমূর্ত্তি নদীর জলে ফেলিয়া দিল। আর তাহারা বুদ্ধদেবের যে মন্দির গড়িয়াছিল তাহা পোড়াইয়া ফেলিল। এমন সময় বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। বজ্র পড়িয়া রাজার বাড়ী ধ্বংস হইয়া গেল। আর যে সকল দুষ্ট মন্ত্রী বুদ্ধমূর্ত্তি জলে ফেলিয়া

দিবার কুপরামর্শ দিয়াছিল তারা সেই সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়া মরিল। এই আকস্মিক ব্যাপারে জাপানীরা ভয় পাইল। তারা আবার তখন তাড়াতাড়ি নদী হইতে বুদ্ধমুর্ত্তি তুলিয়া প্রতিষ্ঠা করিল। আবার মূর্ত্তির জন্যে সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিল। কিন্তু ইহার পরেও মড়ক থামিল না। আবার মড়ক আরম্ভ হইল। তখন আবার জাপানীরা রাগ করিয়া বুদ্ধমূর্ত্তি জলে ফেলিয়া দিল। ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। আর যে সমস্ত পূজারিণী সন্ন্যাসিনীদের তত্ত্বাবধানে ঐ মূর্ত্তিটি ছিল তাদের সকলের সামনে বেত মারা হইল। কিন্তু ইহাতেও জাপানীদের কষ্ট গেল না। দেবতারা সন্তুষ্ট হইলেন না। লোকের পূর্ব্বের মতই কষ্ট রহিল আর পূর্ব্বের মত মহামারীতে মৃত্যু হইতে লাগিল। অবশেষে রাজা ভগ্ন-হৃদয়ে মারা গেলেন।

জাপানীরা তখন ভাবিল যে ঐ পবিত্র মূর্ত্তির অবমাননা করার জন্য তাহাদের এই দুর্দ্দশা। তাহাদের পাপের জন্যই ভগবান বুদ্ধ তাহাদের এমন শাস্তি দিতেছেন

পুনঃ প্রতিষ্ঠা

এই ভাবিয়া তাহারা অনুতপ্ত হইল। তখন তাহারা আবার ভক্তিসহকারে নদীগর্ভ হইতে বুদ্ধমূর্ত্তি তুলিয়া আনিল। আবার ধূম ধামের সঙ্গে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিল। আবার তার উপর সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিল। এইরূপে নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ধীরে ধীরে বিস্তার হইতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

জাপানে বৌদ্ধ যুগ

৫৯৩ খৃষ্টাব্দে চল্লিশ বৎসর বয়সে সৈকুরাণী জাপানের সিংহাসনে বসেন। ইনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন, ইহার বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। যাহাতে জাপানীরা ধর্ম্মপরায়ণ হয় এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সৈকুর রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল প্রচার হয়। ইহার রাজত্বকালে ইহার ভ্রাতুষ্পুত্র শোতোকু

দাইসি মন্ত্রী হইলেন। ইহার ন্যায় বহুগুণ সম্পন্ন জাপানী খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইনি বিদ্বান, বিচক্ষণ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। এরূপ একাধারে রাজনৈতিক, ধর্ম্মপ্রচারক, যোদ্ধা, পণ্ডিত ও লোকবৎসল লোক প্রায় দেখা যায় না। আজও জাপানীরা ইঁহার নাম ভক্তির সঙ্গে উচ্চারণ করিয়া থাকে। ইনি জাপানের বিধি ব্যবস্থার অনেক সংস্কার করেন আর একমাত্র শোতোকুবের চেষ্টা যত্নেই জাপানের সর্ব্বত্র বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ধর্ম্মাত্মা শোতাকুর কথা

বৌদ্ধ প্রভাবের কথা

বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংস্পর্শে জাপানীদের রীতি নীতি আচার ব্যবহার যথেষ্ট উন্নত হইয়া উঠিল। এই নবীন ধর্ম্মে তাহাদের জীবনে যেন এক নূতন উৎসাহ নূতন শক্তি জাগিয়া উঠিল। তাহাদের অনেক কালের কুসংস্কার, অনেক দিনের কু-প্রথা, অনেক সামাজিক আবর্জ্জনা দূরে গেল।

নবীন ধর্ম্মে

সর্ব্বত্র জ্ঞানের আলো ফুটিয়া উঠিল, সর্ব্বত্র প্রেমের আদর আরম্ভ হইল। পরশমণির স্পর্শে লোহা যেমন সোনা হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে জাপানীদের তেমনি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল।

শিল্প কলা

তোমরা জাপানী খেলনা, জাপানী পুতুল দেখিয়াছ সন্দেহ নাই। সেগুলি কেমন সুন্দর, কেমন কারুকার্য্যপূর্ণ। চক্‌চকে রংয়ে আঁকা, জাপানী ছবিগুলি কেমন সুন্দর! জাপানী পর্দ্দা, জাপানী ফানুষ, দেখিলে কার না ভাল লাগে? কিন্তু জাপানীদের এইসব পূর্ব্বে ছিল না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের এই চারু শিল্পগুলি উন্নত হইতে থাকে। চিত্র, শিল্প, ভাস্কর ও বস্তুশিল্পের অপূর্ব্ব উন্নতি এই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। এক কথায় জাপানীরা আগের চাইতে সব বিষয়ে অনেক সভ্য হইয়া উঠিল।

নগর নির্ম্মাণ

এতদিন পর্য্যন্ত জাপানীদের কোন পাকা রাজধানী ছিল না! যখন যিনি রাজা হইতেন তখন তাঁর যেখানে ইচ্ছা হইত সেইখানে থাকিতেন। এক্ষণে একটি স্থায়ী রাজধানী নির্ম্মাণ করিবার বন্দোবস্ত হইল। ইহার ফলে নারায় প্রথম রাজধানী নির্ম্মিত হইল। অতি অল্পদিনের মধ্যে সহরটি মন্দিরে, মঠে, সুন্দর সুন্দর বাড়ী ও প্রাসাদে সুশোভিত হইল। বড় বড় বিচিত্র বৌদ্ধ মন্দিরগুলি জাপানের শিল্প কলার পরিচয় দিল। মন্দিরের ফটকে বড় বড় ঘণ্টা থাকিত। প্রত্যহ প্রভাতে নগরবাসীরা ঐ মধুরধ্বনি শুনিয়া দলে দলে উপাসনা মন্দিরে উপস্থিত হইত। ফুলের মত সুন্দর জাপানী বালক বালিকা, ধর্ম্মভীরু পিতামাতার সঙ্গে আসিয়া বুদ্ধের আরাধনায় যোগদান করিত। ধূপের গন্ধে, ফুলের বাসে মন্দিরগুলি আমোদিত হইয়া উঠিত। বৌদ্ধভিক্ষুদের বিচিত্র পীতবর্ণ পোষাক, মন্দিরের গায়ে বিচিত্র চিত্র, মধুর উচ্চারিত বুদ্ধের স্তব জাপানীদের প্রাণে ভক্তির সঞ্চার করিত। শাল, দেবদারু কুঞ্জ বেষ্টিত, বিচিত্র কারুকার্য্য শোভিত বৌদ্ধ প্যাগোডা

বা মন্দিরগুলি যেন একাধারে সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার ছবির মত দেখাইত। এই সহরে পিতলের একটি প্রকাণ্ড বুদ্ধ মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। মূর্ত্তিটি আজও আছে। আর এই সময়েই জাপানীদের প্রকৃত জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। জাপানের ইতিহাস, কাব্য, জাপানী নাবিকদের বীরত্বের কাহিনী সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর গল্প রচিত হইতে আরম্ভ হইল। এক কথায়, এই সময়টি জাপানী সাহিত্য ও শিল্পের গৌরবের যুগ।

আমাদের দেশে রাজা অশোকের সময় ভারতের যে উন্নতি ঘটে, সে কথা ইতিহাসে পড়িয়াছ সন্দেহ নাই। এই জাপানীদের জাতীয় উন্নতি অনেকটা ঐ রকমের। তবে সম্রাট অশোকের রাজ্যে যে একটা বিরাট সভ্যতা, শিল্পকলা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশ হয়, সেই অতীত গৌরবের কথা আজও বড় বড় মন্দিরে পর্ব্বতগুহায় প্রস্তর স্তম্ভে, ও প্রস্তর-ফলকে লিখিত আছে। তার তুলনায় ইহা অতি সামান্য হইলেও জাপানের ইতিহাসে ইহা একটা গৌরবের যুগ। একটা জাতির উপর একটা নবধর্ম্মের অপূর্ব্ব প্রভাবের কাহিনী।



বিরাট বুদ্ধ মূর্ত্তি।

জাপান—পৃঃ ৩৬।

দশম পরিচ্ছেদ

রাজধানী পরিবর্ত্তন

নারায় সর্ব্ব সমেত চার জন রাজা ও তিনটি রাণী পঁচাত্তর বৎসর রাজত্ব করেন।

এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব হেতু বৌদ্ধপুরোহিত-দিগের অত্যন্ত আধিপত্য বাড়িয়া উঠে। দিন দিন তাহাদের ক্ষমতা এতদূর বৃদ্ধি হয় যে ক্রমে তাহারা কেবল ধর্ম্মকর্ম্ম বিষয়ে নহে, রাজকার্য্য, সামাজিক বিষয়ে ও শাসন ব্যাপারে অযথা হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে।

তাহাদের এই অন্যায় আধিপত্যে রাজা প্রজা সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিল। তখন বৌদ্ধ পুরোহিতদিগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য রাজধানী অন্যত্র উঠাইয়া লইবার পরামর্শ হইল। অবশেষে রাজা জীমু হইতে পঞ্চাশ পুরুষ, সম্রাট কোয়ামু ৭৮৪ খৃঃ অঃ নারা হইতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া গেলেন। এই নূতন রাজধানীর নাম কিওটো। পূর্ব্বে ইহার নাম হিয়াঞ্জো বা শান্তির সহর ছিল। এই সময় হইতে ১৮৬৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত জাপানের রাজারা কিওটো সহরে বাস করিতেন।

এই নারা হইতে রাজধানী তুলিয়া লইবার পর হইতেই রাজাদের ক্ষমতার হ্রাস হইতে থাকে। পূর্ব্বে তোমাদের যে সামুরাইদের কথা বলিয়াছি, এই সময় হইতে এই সামুরাইদের এক একটি বংশ এক এক সময় পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়া জাপানের শাসনভার গ্রহণ করে। এই সব বিখ্যাত সামুরাই বংশই একের পর একটি করিয়া জাপানের প্রকৃত অধীশ্বর ও শাসন কর্ত্তা হয়। এই সময় হইতে প্রকৃত রাজা কেবল নামে মাত্র রাজা থাকেন।

রাজ শক্তির অবসান

একাদশ পরিচ্ছেদ

গল্পে আছে যে যখন সূর্য্যদেবের পৌত্র স্বর্গ হইতে নামিয়া আসেন তখন আমাসূকোয়েন নামে একজন দেবতা তাঁর অনুচর ছিলেন। ইহার বংশধরগণ রাজ্যের প্রধান পুরোহিতের পদপ্রাপ্ত হন। ধীরে ধীরে অন্যান্য বিষয়েও ইহাদের আধিপত্য বিস্তার হইতে থাকে। শাসনকার্য্যেও ইহাদের বিশেষ হাত ছিল। নারা হইতে

রাজধানী পরিবর্ত্তন করিবার সময় ইহারা রাজাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ক্রমে ইহারা অত্যন্ত প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই বংশের নেতা কামাতুরা প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন এবং তিনিই ফুজিওয়ারা উপাধি গ্রহন করেন। সেইদিন হইতে এই পুরোহিতবংশ ফুজিওয়ারার বংশ বলিয়া পরিচিত হইল। দিন দিন ইহাদের ক্ষমতা বাড়িতে লাগিল, অবশেষে রাজা নিজেই তাহাদের অধীন হইয়া পড়িলেন। যদি কখনও কোন রাজা ইহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাধীন ভাবে চলিতে চাহিতেন, অমনি তাঁহাকে সিংহাসন হইতে সরাইয়া দেওয়া হইত, আর তাঁহার স্থানে প্রায়ই কোন একটী নাবালক রাজপুত্রকে বসাইয়া দেওয়া হইত। আর প্রায়ই দেখা যাইত যে ঐ নাবালকের মা বা দিদিমা ফুজিওয়ারা বংশের মেয়ে; কারণ ফুজিওয়ারাগণ তাহাদের মেয়েদের প্রায়ই রাজবংশে বিবাহ দিত। এইরূপে ফুজিওয়ারাবংশ অপ্রতিহত প্রতাপে তিন শত বৎসর জাপান শাসন করিয়াছিল।

ফুজিওয়ারা উপাধি গ্রহণ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

টায়রা বংশের কথা

দীর্ঘকাল ভোগ বিলাসে থাকিয়া ফুজিওয়ারাগণ দুর্ব্বল ও দুশ্চরিত্র হইয়া পড়ে', তখন টায়রা ও মীনমতো নামে দুইটী বংশ প্রবল হইয়া ওঠে। ইহারা যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। এদের অনুগত লোকজনও যথেষ্ট ছিল। ইহারা দুর্ব্বল ও বিলাসী ফুজিওয়ারা-দিগকে ঘৃণা করিত। ক্রমে ফুজিওয়ারাদের আধিপত্য চলিয়া গেল। উভয়বংশের শত্রু ফুজিওয়ারাদের পতন হইলে এই দুই বংশের মধ্যে দারুণ রেষারেষি আরম্ভ হয়। এই সময় হইতেই জাপানের ইতিহাস স্বজাতির রক্তস্রোতে নিত্য কলুষিত হইতে লাগিল। অবশেষে দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলিল, কখন এক দল হারে, কখন অপরদল জিতে। এই যুদ্ধে জাপানের অনেক সম্ভ্রান্ত জমিদার ও ক্ষত্রিয় যোগদান করিয়াছিলেন। জলে স্থলে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে

ফুজিওয়ারা বংশের পতন

লাগিল। কত গৃহ শ্মশান হইল। জাপানের কত শস্যশ্যামল ভূমি রক্তে লাল হইয়া গেল। উভয় পক্ষেই স্ত্রীপুরুষ অপূর্ব্ব সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিল। কত নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটিল। এমন কি জাপানীরা শত্রুর মাথা কাটিয়া সময় সময় সম্রাটের নিকট উপঢৌকন পাঠাইতে লাগিল কিন্তু কোন দলই নিরস্ত হইল না। অবশেষ দ্বাদশ শতাব্দীতে টায়রা বংশের নেতা কিউমোরী মীনমতো দলের উপর সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন। এই সময় হইতে বাইস বৎসর পর্য্যন্ত টায়রা বংশ প্রবল থাকে। আর তখন জাপানের শাসন ইহাদের হাতে ছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শোগান বা সেনাপতি বংশের উৎপত্তির কথা

"আহা থাক্ থাক্, ওকে মের না। এইটুকু ছেলেকে মেরে কি হবে? আহা, ছেলেটি বড় সুন্দর। দেখ, ভয়ে কেমন কাঁপ্‌ছে। আর ওর পিতা, তোমার শত্রু ছিল বলিয়া এ দুধের ছেলে তোমার শত্রু নয়। এ তোমার

কোন অনিষ্ট করেনি :” এই বলিয়া কিউমোরির বিমাতা বালক ওরিতুমুকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। বিমাতার অনুরোধে কিউমোরি বালককে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে একদিন এই বালকই তার বংশের উপর পিতৃ মাতৃ হত্যার ভীষণ পরিশোধ লইবে।

বালক ওরিতুমুর প্রাণ রক্ষা

কিউমোরি মীনমতোদের জয় করিয়া মীনমতো বংশের প্রায় সকলকেই বধ করেন। কেবল মাত্র বিমাতার অনুরোধে মীনতোবংশের নেতা ও সিতুমুর তৃতীয় পুত্র শিশু ওরিতুমু ও সিতুমুর দাসী পুত্র ওসীৎসুনীর প্রাণ রক্ষা করিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে প্রাণভয়ে ওরিতুমু ও ওসিৎসুনী কিউমোরির প্রাসাদ হইতে একসঙ্গে পলাইয়া আসিয়া মীনমতো বংশের যে দুই এক ঘর নিকট আত্মীয় কিউমোরির ভয়ে লুকাইয়া ছিল তাদের আশ্রয় লইল।

ক্রমে ওরিতুমু সবল সাহসী যুবক হইয়া উঠিল। দিবারাত্রি তাঁহার হৃদয়ে মীনমতো বংশের লুপ্ত গৌরবের

কথা, পিতামাতার নিষ্ঠুর হত্যার কথা, আত্মীয় স্বজনের বিনাশের কথা জাগিতে লাগিল। ওরিতুমু ভাবিত যে সে যদি একদিন ইহার প্রতিকার করিতে পারে, যদি মীনমতোর লুপ্ত গৌরব আবার ফিরাইতে পারে তবেই তার বাঁচা সার্থক, নতুবা তার মরাই ভাল ছিল।

ওরিতুমুর লোক সংগ্রহ

ওরিতুমু এই প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় ছদ্মবেশে নানা স্থান ঘুরিয়া লোক সংগ্রহ করিতে লাগিল। তার সরল স্বভাব, সুন্দর চেহারা, অতুল সাহস দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইল। তার উপর লোকে যখন তার মুখে তার পিতামাতার হত্যার কথা, মীনমতোদের দুর্দ্দশার কথা শুনিত, তখন জাপানীদের প্রাণ দুঃখে ও সহানুভূতিতে গলিয়া যাইত। সকলেই ওরিতুমুকে সাহায্য করিতে সম্মত হইল। আর এই লোক সংগ্রহ কার্য্যে তাহার প্রধান সহায় ছিল দাসীপুত্র ওসীৎসুনী। সে ওরিতুমুর ন্যায়ই সাহসী বলবান ও যুদ্ধপটু ছিল। ওরিতুমু সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

ওরিতুমু যখন নানাস্থানে এইরূপে লোক যোগাড়

করিবার জন্য ঘুরিতেছিল তখন একদিন হুজু বংশের কন্যা মাসাগোর সঙ্গে দেখা হয়। মাসাগো ওরিতুমুর দুঃখের কাহিনী শুনিয়া ব্যথিত হইলেন। আর ওরিতুমু মাসাগোর রূপে মুগ্ধ হইলেন। দুইজনেই দুইজনকে ভালবাসিলেন। কিন্তু মাসাগোরার পিতা এই বিবাহে অসম্মত হইলেন। পৃথ্বিরাজ যেমন স্বয়ংবর সভায় ছদ্মবেশে লুকাইয়া থাকিয়া সংযুক্তাকে বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, ওরিতুমুও তেমনি ভাবে মাসাগোকে লইয়া গিয়া বিবাহ করিলেন। ১১৮১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ও শাসনকর্ত্তা টায়রা বংশের নেতা কিউমোরির মৃত্যু হয়। তখন মিনমতোর দলের লোক মাথা তুলিয়া উঠিল। আর বীর ওরিতুমু ও ওসীৎসুনী তাদের নেতা হইল। তখন দুইদলে আবার ভীষণ যুদ্ধ বাঁধিল। আবার নদীর মত রক্তের স্রোত বহিল। অবশেষে ১১৫৮ খৃষ্টাব্দে ওসীৎসুনীর নেতৃত্বে মীনমতোরা

ওরিতুমুর পানিগ্রহণ

টায়রাদিগের পতন

দানৌরায় একটি প্রকাণ্ড জলযুদ্ধে টায়রাদিগকে পরাস্ত করে। এবং ঐ দিন হইতে টায়রা-বংশের অধিপত্য একেবারে লোপ পাইল। টায়রাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ডুবিয়া মরে, নতুবা ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারায়। রাজ-পরিবারেরও অনেক মারা যায়, সেই সঙ্গে সাত বছরের রাজা অন্তুকুকে ডুবাইয়া মারা হয়। এই যুদ্ধের পর মীনমতোরা প্রাধান্য লাভ করে।

ওরিতুমু তখন জাপানের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। তাঁর লোক লস্কর, ধন রত্ন প্রতিপত্তি কিছুরই অভাব রহিল না। ওরিতুমু তখন তাঁহার পিতৃ পুরুষের পূর্ব্ব বাসস্থান কামাকুরায় তাঁর রাজধানী স্থাপন করিলেন। দেখিতে দেখিতে কামাকুরা ব্যবসা বাণিজ্য, ধন ঐশ্বর্য্যে লোক সংখ্যায় জাপানের দ্বিতীয় রাজধানী হইয়া উঠিল। শোভায় সম্পদে কামাকুরা কীওটোকেও পরাস্ত করিল।

ওরিতুমুব কামাকুরায় রাজধানী নির্ম্মাণ

কামাকুরায় এক প্রকাণ্ড দুর্গ ও বিচিত্র প্রাসাদ

নির্ম্মাণ করিলেন। বাহু সম্পদে, সৈন্য সামন্তে ওরিতুমু রাজাকেও পরাস্ত করিলেন। কিন্তু ওরিতুমু প্রকাশ্য ভাবে রাজাকে তুচ্ছ বা অমান্য করিলেন না; বরং তিনি রাজার কাছে হইতেই জাপানের শাসন কার্য্যের ভার পাইয়াছেন এইরূপই জানাইলেন। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে রাজা তাঁহাকে খুব ধুম ধামের সঙ্গে সি—ই—তাই শোগান বা বর্ব্বর দমনকারী সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি এই গৌরবসূচক উপাধিতে ভূষিত করিলেন। ওরিতুমুই জাপানের সর্ব্বপ্রথম শোগান। তিনিই রাজার নামে সমস্ত জাপান শাসন করিতে লাগিলেন। দেওয়ানী ফৌজদারীর উচ্চ কর্ম্মচারী, প্রদেশের শাসন কর্ত্তা, সৈন্যদিগের সেনাপতি সমস্তই তিনি নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাহার দুর্দ্দণ্ড প্রতাপে বাধা দিবার আর কেহ রহিল না। জাপানীরা তখন কামাকুরাকে তাদের প্রকৃত রাজধানী ও শোগানকেই তাদের শাসন কর্ত্তা বলিয়া জানিল। জাপানীরা ভাবিত তাদের দু'জন রাজা। একজন পার্থিব দেবতা, তিনি

শোগান আধিপত্য



থাকেন কীওটো প্রাসাদে। তিনিই জাপানের প্রকৃত অধীশ্বর। আর একজন, তাদের দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা, তিনি থাকেন কামাকুরায়। তারা প্রথম রাজাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিত, দ্বিতীয়টিকে দেশের শাসন কর্ত্তা বলিয়া ভয় করিত।

ওরিতুমুর প্রভাব যখন চরম শিখরে উঠিল তখন তাঁহার ওসীৎসুনীর সঙ্গে মনান্তর ঘটে। তিনি ওসীৎ-

ভ্রাতৃবিচ্ছেদ

সুনীর পূর্ব্ব উপকারের কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে রাজধানী হইতে তাড়াইয়া দেন। এমন কি তাঁহার সিদ্‌জুকা নাম্নী একটি জাপানী রমণীর সঙ্গে ওসীৎসুনীর মেশামিশি ছিল বলিয়া

অন্তঃপুরচারিণী

তাহাকে সন্দেহ করিয়া তার মৃত্যুর আদেশ দিবেন স্থির করেন। তখন ওরিতুমুর দয়াবতী পত্নী মাসাগোর পরামর্শে সিদ্‌জুকা ওরিতুমুর মনস্তুষ্টির জন্য প্রাসাদ মধ্যে নাচ গানের আয়োজন করিল। সিদ্‌জুকার মধুর নৃত্য গীতে ওরিতুমু ছাড়া সকলেই মুগ্ধ হইল। স্বামীকে সিদ্‌জুকার উপর খুসী হইতে না দেখিয়া মাসাগো নিজে তাহার

জন্য প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়া দুর্ভাগিনী সিদ্‌জুকাকে রক্ষা করেন। এইরূপ প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করিয়া দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে খৃষ্টাব্দে ওরিতুমুর মৃত্যু হয়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

হুজু বংশের উদয়

ওরিতুমু মৃত্যুকালে তাঁহার দুই পুত্র রাখিয়া যান। কিন্তু বিশ বৎসর মধ্যে তাঁর দুই ছেলেরই অপঘাতে মৃত্যু হয়। আর এই মৃত্যুতেই মীনমতো বংশের শেষ হইল।

মাসাগোর কথা

একমাত্র জীবিত রহিলেন ওরিতুমুর বিধবা পত্নী মাসাগো। মাসাগোর ন্যায় গুণবতী ও রাজনীতিতে সুপণ্ডিতা রমণী ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। মাসাগোর পিতৃকুল হুজু বংশের উপর যথেষ্ট টান ছিল। যখন তাঁর দুই পুত্রেরই মৃত্যু হইল তখন যাহাতে তাঁর স্বামী পুত্রের উচ্চ অধিকার তার পিতৃকুলের হাতে থাকে সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবতী হইলেন। আর একমাত্র তাঁরই চেষ্টায়

হুজুবংশ শোগানদের উচ্চ স্থান অধিকার করিল।

সীক্কেন উপাধী গ্রহণ

হুজুরা শোগান উপাধী লন নাই, ইহারা আপনাদের সীক্কেন বা সর্ব্ব ক্ষমতার আধার বা অধিকারী বলিয়া পরিচয় দিতেন। এই হুজুবংশের হাতে ১১৪ বৎসর কাল জাপানের শাসন ভার থাকে। এদের সময়ে জাপানের একবার ভাগ্য পরীক্ষা হয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চীনের জাপান আক্রমণ

চীনদেশের মোগল সম্রাট কুব্লাখাঁর রাজত্বকালে সমুদ্রতীরবাসী চীনেরা জাপানী জলদস্যুর উৎপাতে বড় বিব্রত হইয়া পড়ে। তাহাদের জ্বালায় চীনদের জিনিষ পত্র, টাকাকড়ি লইয়া জলপথে আসা যাওয়া কঠিন হইত। বেশী লোক জন বা সৈন্য সামন্ত দেখিলে উহারা পলাইয়া যাইত। আবার সুবিধা পাইলেই চীনদের নৌকা মারিয়া সমস্ত লুটপাট করিয়া লইয়া

যাইত। সম্রাট কুব্‌লাখাঁ জাপানীদের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য জাপান আক্রমণের জন্য বিরাট আয়োজন করিলেন। বিশেষ অনেক দিন হইতেই তাঁহার মনে জাপান-জয়ের ইচ্ছা ছিল। জাপান আক্রমণের জন্য অনেক বড় বড় জাহাজ তৈয়ারী হইল। সম্রাটের সেনাপতিরা বাছিয়া বাছিয়া প্রায় দেড় লক্ষ সুদক্ষ নাবিক ও সৈনিক যোগাড় করিলেন। সমস্ত যোগাড় হইলে, সেই বিরাট বাহিনী জাপানের অভিমুখে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে জাপানীরা তাহাদের ছোট ছোট নৌকায় চড়িয়া এই সব জাহাজের বিস্তর ক্ষতি করিতে লাগিল। অবশেষে চীনের জাহাজগুলি আসিয়া জাপানের তীরে লাগিল। কিন্তু যখন চীন সৈন্য জাহাজ হইতে নামিয়া জাপান আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিল,তখন সমুদ্র মধ্য হইতে হঠাৎ একটা ঘূর্ণী বাতাস ও প্রকাণ্ড ঝড় উঠিয়া চীনের জাহাজগুলি লণ্ড ভণ্ড করিয়া ফেলিল। অনেকগুলি জাহাজ অল্প জায়গার মধ্যে নঙ্গর করিয়া থাকায় সবগুলিই চুরমার হইয়া গেল। এই দৈব-দুর্বিপাকে চীনদের আক্রমণ ব্যর্থ হইল।

এই জাপান অভিযানের সঙ্গে একজন ইউরোপীয় পর্ত্তুগীজ ছিলেন। ইঁহার নাম মার্কোপোলো। ইনি ১২৭৫ হইতে ১২৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১৭ বৎসর কাল সম্রাট্ কুবলা খাঁর সভায় ছিলেন। ইউরোপবাসীদের মধ্যে মার্কোপোলোই প্রথম জাপান দর্শন করেন। তিনি জাপান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তার সারাংশ অনেকটা এইরূপ :—

মার্কোপোলোর কথা

"পূর্ব্ব সাগরে জীপাঙ্গু নামে একটি বড় দ্বীপ আছে। এদেশের লোক গৌরবর্ণ ও সুস্থ সবল। ইহারা আচার ব্যবহারে বেশ সভ্য, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইহারা স্বাধীন। এই দেশের লোক পৌত্তলিক। এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে সোণা পাওয়া যায়। শোনা যায় রাজপ্রাসাদের ছাদ সোণার পাতে মোড়া, মেঝে সোনার তৈয়ারী। অনেক ঘরে ছোট ছোট সোণার টেবিল আছে। কিন্তু এ দেশের রাজা সোণা বিদেশে চালান করিতে দেন না। এই জন্য খুব কম বণিকই

মার্কোপোলো ও জাপান

এদেশে আসিয়া থাকে। এ দেশে মুক্তা যথেষ্ট পরিমাণে আছে, কেবল সাদা রংএর মুক্তা নয়, উজ্জ্বল ফিকে গোলাপী রংএর বড় বড় সুগোল মুক্তা বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। সাদা মুক্তার অপেক্ষা ঐ গুলির দাম বেশী। জাপানীদের মধ্যে একদল মৃতদেহ সৎকার করে, আর একদল মাটি দেয়। কবর দিবার সময় ইহারা মৃত ব্যক্তির মুখের মধ্যে একটি মুক্তা দিয়া মাটি দেয়। এই দ্বীপে অনেক প্রকার বহুমূল্য রত্ন পাওয়া যায়।”

জাপান সম্বন্ধে ইউরোপবাসীর এই প্রথম জ্ঞান। ইহার অনেক পরে ইংরেজেরা জাপানে আসেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিদ্রোহ

‘দেব! আমাকে শক্তি দেও। এ নিরাশ হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ কর। তুমিই আমাদের রক্ষক। বিদেশীর হস্ত হইতে এ পবিত্রভূমি রক্ষা করিতে তুমিই তাকে

তরঙ্গ বাহুদ্বারা বেষ্ঠন করিয়া রাখিয়াছ। বর দাও, যেন ঐ দুর্ভেদ্য দুর্গ চূর্ণ করিয়া, দুর্ব্বলকে প্রবলের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারি। এই তোমার অতল গর্ভে অসি বিসর্জ্জন করিলাম। যদি দেবতার আশীর্ব্বাদ পাই, তবে আবার নূতন উৎসাহে নূতন অসি ধারণ করিব।'

এই বলিয়া জাপানের বিপ্লবনেতা নিট্টাওসীসাদ জলদেবতার কাছে প্রার্থনা করিয়া, সমুদ্র মধ্যে তাঁহার তরবারি নিক্ষেপ করিলেন। দূরে কামাকুরার দুর্ভেদ্য দুর্গ ভ্রুভঙ্গী করিয়া আছে, আর সমুদ্রকূলে সীক্কেনদিগের অসংখ্য রণতরী দম্ভভরে নিশান তুলিয়া শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। ঐ কামাকুরা না দখল করিতে পারিলে জাপানে অত্যাচারের অবসান হইবে না। যতদিন না অত্যাচারী শাসনকর্ত্তার ক্ষমতার হ্রাস হয় ততদিন পর্য্যন্ত জাপানীরা তাদের নিজের দেশেই পরাধীন দাসের মত থাকিবে। এই জন্য দেশভক্ত স্বার্থত্যাগী বীর নিট্টাওসীসাদ, ও কুসুনোকী মাসাহিজ্ প্রপীড়িত দেশবাসীর হইয়া তরবারি গ্রহণ করেন।

তাঁহাদের সঙ্গে আশীকগাভকৌজি—নামে একজন দুরাকাঙ্ক্ষী যোদ্ধা ছিলেন। এই তিনজন বিপ্লবের নেতা হইলেন। এক্ষণে যে কারণে এই বিদ্রোহ ঘটে তাহা শোন।

সীক্কেনেরা অর্থাৎ লুজ বংশীয়েরা যখন প্রথম উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখন তাঁরা নিজেরাই রাজকার্য্য দেখা-শোনা করিতেন,কিন্তু ক্রমে তাঁহারা বিলাস-ভোগে থাকিতে থাকিতে অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা আর শাসনকার্য্যের কিছুই দেখিতেন না। তাঁহারা ঐ সমুদয় কার্য্য দেখাশোনা করিবার জন্যে তাঁহাদের অধীনে মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। এ সব মন্ত্রীরা কীনরাও নামে পরিচিত হইল। দেখিতে দেখিতে কীনরাওগণ প্রকৃত শাসনকর্ত্তা হইয়া উঠিল। সীক্কেনেরা নামেমাত্র বড় রহিলেন। বিলাস ও আলস্যে অতি অল্পদিনের মধ্যেই মানুষ অপদার্থ হইয়া পড়ে। কীনরাওয়েরাও দেখিতে দেখিতে অকর্ম্মণ্য ও অত্যাচারী হইয়া উঠিল। ক্রমে জাপানে

বিদ্রোহের কারণ

কীনরাওদের কথা

চার্ চার্‌টি শাসন কর্ত্তা দাঁড়াইল। প্রথম, রাজা; দ্বিতীয়, শোগান; তৃতীয়, সীক্কেন, ইঁহারা শোগানদের নিকট হইতে শাসন ভার পাইয়াছেন বলিয়া দেখাইতেন; চতুর্থঃ, কীনরাওয়েরা সীক্কেনদেরই নিযুক্ত মন্ত্রী। কিন্তু নামে এই চারিজন শাসনকর্ত্তা হইলেও কাজে বড় কেহই শাসন করিতে পারিতেন না। এই সময়ে জাপানের প্রকৃত শাসন কর্ত্তা ছিল দাইমিউ—বা জেলার কর্ত্তা। পূর্ব্বে শোগান ও সীক্কেনেরা তাঁহাদের অধীনস্থ সেনাপতিদিগকে ঐ পদে নিযুক্ত করিতেন। কীনরাওদের আমলে ঐ শাসনকর্ত্তারা ক্রমে জেলার মালিক ও সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিল। ক্রমে ঐ উচ্চপদ ইহাদের বংশগত হইয়া দাঁড়াইল। এই সকল দাইমিউএর অধীনে অনেক যোদ্ধা থাকিত। সুতরাং তাঁহারা বড় কাহাকেও একটা মানিতেন না। তখন জাপানের একমাত্র শক্তিশালী সম্প্রদায় সামুরাইগণ। কিন্তু এই সামুরাইদের নিজেদের মধ্যে একতা না থাকায় তাহারা দেশের মঙ্গলের অপেক্ষা অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিল। কেউ কারও কথা শুনিত না, কেউ কাহাকেও

মানিত না। শাসনকার্য্যে কোন একটা শৃঙ্খলা রহিল না। সবাই প্রধান, সবাই কর্ত্তা। ফলে, দেশে অত্যাচার অবিচার ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। তখন অনেক জাপানী, সরকারের বিরুদ্ধে বাঁকিয়া দাঁড়াইল। দেশে বিদ্রোহের আগুণ জ্বলিয়া উঠিল।

কীনরাওদের অধীনে তিন জন সেনাপতি ছিলেন নিট্টাওসীসাদ, কুস্থনোকী ও আশীকগা তকৌজি। ইহাঁরা বিদ্রোহিদের নেতা হইলেন। নিট্টাওসীসাদ ও কুস্থনোকী কেবল মাত্র স্বদেশ প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া এই বিদ্রোহে যোগ দিলেন কিন্তু আশীকগা মনে মনে দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে ছিলেন। বীর নিট্টা ও কুস্থনোকী বহুযুদ্ধে রাজশক্তিকে পরাস্ত করিলেন। নিট্টা তখন ভাবিলেন যে অত্যাচারী ও স্বার্থপরায়ণ শাসনকর্ত্তাদের কবল হইতে নিঃসহায় দরিদ্র প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে ঐ রাজশক্তির কেন্দ্রভূমি কামাকুরা ধ্বংশ করিতে হইবে। ইহা ভাবিয়া নিট্টাওসীসাদ কামাকুরার দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সুরক্ষিত সহর সহজে

যুদ্ধারম্ভ

অধিকার করা সহজসাধ্য নয়। স্থল পথ দিয়া গেলে সম্মুখে প্রকাণ্ড দুর্গ, সাম্‌না সাম্‌নি সেই দুর্গ দখল করা এক প্রকার অসম্ভব; তাই তিনি সমুদ্রের ধার দিয়া অগ্রসর হইলেন, কিন্তু পৌঁছিয়া দেখিলেন, সমুদ্রের ধারে সারি সারি রণতরী সজ্জিত। তখন নিরুপায় হইয়া ভগবানের কাছে যুক্তকরে জয় ভিক্ষা করিলেন। গল্পে আছে, যে তিনি সমুদ্রাধিপতি

কামাকুরার ধ্বংস

দেবতার কাছে প্রার্থনা করিয়া দেবতার সম্মানার্থে তাঁহার তরবারী সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পরদিন কামাকুরা আক্রমণ করিতে গিয়া দেখিলেন যে একখানি জাহাজও নাই। সমুদ্রের প্রবল স্রোতে সবগুলি ভাসিয়া গিয়াছে! তখন ভীষণ যুদ্ধ করিয়া কামাকুরা দখল করিলেন। বিজয়ী সৈন্যেরা কামাকুরা ধ্বংস করিয়া ফেলিল। হুজুদের প্রায় সবাই মরিল। কিন্তু দেশে শান্তি ও সুশাসন ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই নিট্টা ও কুস্থনোকীর মৃত্যু ঘটে। তখন আশীকগা তকৌজি একমাত্র নেতা হইয়া দাঁড়াইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নূতন শোগান বংশের সৃষ্টি

আশীকগা একজন বড় যোদ্ধা হইলেও নিতান্ত স্বার্থপরায়ণ ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি দেশের এই অরাজকতার সুযোগ লইলেন। তিনি আপনাকে শোগান বলিয়া পরিচয় দিলেন। এই উপাধি পূর্ব্বে জাপানের সম্রাট্ দিতেন, কিন্তু আশীকগা বিজয় গর্ব্বে নিজেই ঐ উপাধি ধারণ করিলেন। আর শোগান পদবী পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে তাঁহার বংশগত করিলেন, সুতরাং তাঁহার বংশের আর কাহাকেও রাজার নিকট হইতে ঐ খেলাৎ চাহিতে হইবে না। শোগানের পুত্র শোগান হইবে।

আশীকগার কথা

১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে নিট্টার আক্রমণে, ওরিতুমুর গর্ব্বস্থল, সুন্দর কামাকুরা সহর যখন ধ্বংস হয় তখন তাহার মধ্যে আশীকগার হাত ছিল। সুতরাং আশীকগা খুব ধূমধামের সঙ্গে কিওটো গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁর প্রকাণ্ড প্রাসাদ, ও বিলাস বৈভব রাজার সম্পদকেও লজ্জা দিল, রাজা কিওটো সহরে নগণ্য হইয়া রহিলেন।

আশীকগা আবার পূর্ব্বের মত প্রবল শোগান বংশ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

আশীকগা বংশের শোগানেরা অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় ছিলেন। তাঁহারা প্রায়ই আমোদপ্রমোদে সময় কাটাইতেন। কিন্তু ইহারা জাপানের শিল্পকলার উন্নতির জন্য যথেষ্ট যত্ন করিতেন। প্রত্যেক শিল্পীই ইহাদের কাছে উৎসাহ পাইত। চিত্র, নাটক, কবিতা প্রভৃতি ললিত-কলার যথেষ্ট উন্নতি হইল। বাগানগুলিকে আরও পরিপাটি করিয়া সাজানো হইল। জাপানদের সৌন্দর্য্য অনুভূতি যেন সকল বিষয়ে ফুটিয়া উঠিল। জাপানী শিল্পের এই উন্নতির যুগ। এই সময় জাপানে চিত্র বিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষতা লাভ করে।

জাপানী শিল্পের উন্নতি

ইতিহাসে একইরূপ ঘটনার অনেক সময় পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। কারণ এক হইলে, ফলও একইরূপ হয়। আশীকগা বংশীয়েরা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সীকেন ও কীনরাওদের মত দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। দেশের আর্থিক

আশীকগাকুলের পতন

ও নৈতিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিল। জন সাধারণের ও চাষাদের কষ্টের অবধি রহিল না। চুরি ডাকাতি বিস্তর বাড়িল। দিন দুপুরে কিওটো সহরে দাঙ্গা হইতে লাগিল। অবশেষে তাহাদের হাত হইতে শাসন দণ্ড খসিয়া পড়িল। তখন নোবুনাগ নামে একজন সেনাপতি রাজ্যের কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। রাজার নামে ইনি নয় বৎসর শাসন করেন। পরে নোবুনাগকে গুপ্তভাবে হত্যা করা হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাধ্যক্ষ হিদীওশী তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। তাইকোহিদীওশীর ন্যায় পরাক্রমশালী ও প্রতিভাবান্ ব্যক্তি জাপানের ইতিহাসে অতি অল্পই দেখা যায়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বীর হিদীওশী

বীর হিদীওশীকে জাপানের নেপোলিয়ান বলা যায়। নেপোলিয়ান যেমন সামান্য অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া পরে স্বীয় প্রতিভাবলে ফরাসী দেশের সম্রাট হ'ন,

হিদীওশী তেমনি অতি হীন অবস্থা হইতে জাপানের সর্ব্বোচ্চপদ অধিকার করেন। ইহার ন্যায় নানা গুণে বিভূষিত ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। হিদীওশী এক অতি দরিদ্র কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় তিনি দুয়ারে দুয়ারে জ্বালানি কাঠ ফেরি করিয়া বেড়াইতেন, তাহার পর জীবনে প্রথম বড় কাজ পাইলেন, সেনাপতি নোবুনাগের সহিসগিরি! নোবুনাগ যখন ঘোড়ায় চড়িতেন বালক হিদীওশী হয় ঘোড়া ধরিয়া দাঁড়াইত, নতুবা তাহাকে ঘোড়ার পিছু পিছু দৌড়াইয়া যাইতে হইত। কিন্তু গুণগ্রাহী নোবুনাগ সহজেই হিদাওশীর লুকায়িত প্রতিভার পরিচয় পাইলেন। তিনি তখন হিদীওশীকে হীন সহিসগিরি কার্য্য হইতে তাহার সৈন্যের মধ্যে একজন কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত করিলেন। হিদীওশী স্বীয় বীরত্ব ও প্রতিভা বলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই নোবুনাগের একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি হইয়া উঠিলেন এবং ক্রমে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন। নোবুনাগের মৃত্যুর পর হিদীওশীই নোবুনাগের স্থান অধিকার করিলেন। হিদীওশী যে কেবল একজন বড় যোদ্ধা

ছিলেন তাহা নহে, তিনি রাজনীতিতে বিশেষ পণ্ডিত, ও শাসনকার্য্যে দক্ষ ছিলেন।

জাপানে শান্তির যুগ

এ পর্য্যন্ত কোন শোগান বা সীক্কেনই তাঁর মত ক্ষমতাশালী হন নাই। তিনি স্বীয় প্রতাপে সমগ্র জাপান এক শাসনাধীনে আনেন। যে সমস্ত প্রতাপশালী জেলা বা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা এ পর্য্যন্ত কোন শোগান বা সীক্কেনের অধীনতা স্বীকার করে নাই তাহারা সকলেই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করিল। সকলেই তাঁহার আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইল। তিনশত বৎসর পরে হিদীওশীই জাপানে আবার শান্তি ফিরাইয়া আনিলেন। টোকিওর আবার 'শান্তির সহর' নাম সার্থক হইল। সমগ্র জাপান এক শাসনাধীন হওয়ায় রাজ্যে আবার সুখ শান্তি ফিরিয়া আসিল। দেশে চুরি, ডাকাতি প্রায় বন্ধ হইল। দেশে আবার চাষবাস, ব্যবসা বাণিজ্য জাগিয়া উঠিল।

১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে হিদীওশীর বিজয়ী সৈন্য কোরিয়া জয় করিবার উদ্দেশে যাত্রা করিল। জাপানীরা কোরিয়া পৌঁছিয়া প্রায় পুরা দেশটি দখল করিয়া ফেলিল।

কোরিয়াবাসীদের সঙ্গে জাপানীদের বিস্তর যুদ্ধ হইল, কোরিয়ার অনেক প্রাচীন সমৃদ্ধশালী নগর ধ্বংশ হইয়া গেল; কিন্তু কেহ হিদীওশীর বিপুল বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না। জাপানীরা বহু ধনরত্ন ও অনেক লোকজন বন্দী করিয়া লইয়া দেশে ফিরিল।

কোরিয়া জয়

কোরিয়া বিজয়ের পরের বৎসর ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে হিদীওশীর মৃত্যু হয়। হিদীওশীর মৃত্যুকালে তাঁর পাঁচ বৎসরের শিশু পুত্রকে তাঁহার বিশ্বস্ত সেনাপতি টোকুগুয়া ইয়েউস্থর হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন। ইয়েউস্থকে তিনি এত ভালবাসিতেন যে শেষ হুজুদের উদাওয়ারা সহর দখল করিয়া হিদাওশী ইয়েসূকে কোয়ান্তুয়ের আটটি জেলা দান করেন, আর তাহাকে ইডো সহরে থাকিতে অনুমতি প্রদান করেন।

হিদীওশীর মৃত্যু

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

তোকুগুয়া বংশের কথা

হিদীওশী যখন মৃত্যুকালে ইয়েউস্যূর হস্তে তাঁহার শিশু পুত্রকে সমর্পণ করিয়া যান, তখন তাঁর বিশ্বাস ছিল যে ইয়েউস্যূ কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। কিন্তু ভাগ্যচক্র ঘুরিয়া ফিরিয়া একই ভাবে চলিতে থাকে। হিদীওশী যেমন নোবুনাগের দুই পুত্রকে ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজেই সর্ব্বোচ্চ পদ অধিকার করিয়াছিলেন, ইয়েউস্যূ তেমনি তাঁর শিশু পুত্রকে সরাইয়া নিজেই তাঁহার পরিত্যক্ত আসন অধিকার করিলেন।

টোকুগুয়া বংশের উৎপত্তি

ইয়েউস্যূ তার পূর্ব্বের বাসস্থান ইডোতেই রাজধানী স্থাপন করিলেন। পূর্ব্বে ইডো সামান্য সহরগুলির মত ছিল, এক্ষণে তাহা দেখিতে দেখিতে একটি প্রকাণ্ড সহর হইয়া উঠিল। এই ইডোসহরই বর্ত্তমান জাপানের রাজধানী টোকিও।

ইয়েউস্যূর এইরূপ স্বার্থপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়া

হিদীওশীর অনুগত অনুচরবর্গ ইয়েউসূর উপর চটিয়া গেল। তাহারা গোপনে গোপনে লোক যোগাড় করিয়া নিজেদের দলপুষ্টি করিতে লাগিল। পরে ক্রমে প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ অরম্ভ হইল। কিন্তু এই যুদ্ধে ইয়েউসূর বিপক্ষ দল হারিতে লাগিলেন। অবশেষ ১৬০০ খৃষ্টাব্দে সিকিগারহারার (Sikigarhara) রক্তাক্ত যুদ্ধে ভাগ্য পরীক্ষা হইল। এই যুদ্ধের মত যুদ্ধ খুব কমই হইয়াছে।

সিকীগারহারার যুদ্ধ

এক প্রাচীন কালে হ্যানিব্যাল রোমানদের বিরুদ্ধে তেমন যুদ্ধ করেন,ও বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাসমরে এমন দুই একটী যুদ্ধ হইয়াছে। এই যুদ্ধে রক্তের নদী বহিয়া গেল। কত জাপানী মরিল তার ঠিক নাই। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কুড়াইয়া চল্লিশ হাজার নরমুণ্ড বিজয়ী ইয়েউসূর সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। যুদ্ধক্ষেত্রের একটি স্থানে ঐ মুণ্ডগুলি পুঁতিয়া রাখা হয়। ঐ মুণ্ডুমালার উপর যে একটা সমাধি নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল তাহা আজও বিদ্যমান আছে। এই যুদ্ধের পরে ইয়েউসূ জাপানের অপ্রতিদ্বন্দী অধিশ্বর হইলেন। ইনি তোকুগুয়া (Tokugowa) বংশের প্রতিষ্ঠিতা।

১৬০৩ খৃষ্টাব্দে ইয়েউস্ (Iyeyusu) সোগান উপাধি গ্রহণ করেন। ঐ সময় হইতে তাঁহার বংশধরগণ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাপান শাসন করেন।

ইয়েউসূর রাজত্বকালে দেশের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়। তিনি দেশের বড় বড় জমিদারদিগকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন। দেশের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। এই সময় হইতে টোকিওর শোভাসম্পদ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। দেশের গণ্যমান্য লোক ঐ সহরেই বাস করিতে লাগিলেন। বড় বড় ভূম্যধিকারিকে বছরের মধ্যে ছয় মাস করিয়া রাজধানীতে থাকিতে হইত। আর বাকি ছয় মাস, পাছে দেশে ফিরিয়া কেহ বিদ্রোহী হয়, এজন্য তাঁহাদের জামিন স্বরূপ তাঁহাদের স্ত্রীপুত্র রাজধানীতে রাখিয়া যাইতে হইত। আর বৎসরান্তে ফিরিয়া আসিয়া নজর দিতে হইত। ইয়েউসূর রাজত্বকালে জাপানীদের ব্যবসা বাণিজ্য আবার জাগিয়া উঠিল। সাধারণ জাপানীরা সুখেই দিন কাটাইতে লাগিল। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে ইয়েউসূর মৃত্যু হয়। ইঁহার ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ ও

ইয়েউস্থর রাজত্বকাল

সর্ব্ব বিষয়ে বিচক্ষণ শাসন কর্ত্তা জাপানে খুব কমই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এত দীর্ঘকাল-স্থায়ী একটী বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই। ওরিতুমু যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইয়েউস্‌ও সেই বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

ইয়েউসূর মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই ভাবে দু'শো বছরের উপর কাটিয়া গেল। ইহার পর হইতে নব্য জাপানের গঠন আরম্ভ হয়। জাপানীদের এই জাতিয় অভ্যুত্থানের সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকার একটা খুব নিকট সম্বন্ধ আছে। এক্ষণে তোমাদের সে কথা বলিব।

বিংশ পরিচ্ছেদ

ইউরোপের সংস্পর্শে জাপান

১৫৪২খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা বাণিজ্যের জন্যে প্রথম জাপানে আসেন। পর্ত্তুগীজেরা তখন ইউরোপের মধ্যে

ব্যবসা বাণিজ্যে সব চেয়ে বড়। তাহাদের বাণিজ্য তরী পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই যাতায়াত করিত। জাপানীরা ইহাদের প্রথমে আদরেই গ্রহণ করে। ইহার পাঁচ বৎসর পরে সুবিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক সেণ্টজেভিয়ার খ্রীষ্ট ধর্ম্ম-প্রচার উদ্দেশে জাপানে পদার্পণ করেন। তাঁহার আগ্রহে ও পরবর্ত্তী ধর্ম্ম-যাজকগণের চেষ্টাযত্নে বহু লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে। ইহার পরে ওলন্দাজদের একখানা জাহাজ জাপানে আসিয়া নঙ্গর করে। ঐ জাহাজে উইল এ্যাডামস্ নামে একজন ইংরাজ কাপ্তেন ছিলেন। ওলন্দাজ ও ইংরাজদের জাপানে আসিতে দেখিয়া পর্ত্তুগীজদের যথেষ্ট হিংসার উদয় হয়। তখন পর্ত্তুগীজদের কৌশলে এ্যাডামস্ বন্দী হন। কিছুদিন কারাগারে বাসের পর এ্যাডামস্ মুক্তি লাভ করেন। পরে তিনি শোগানদের জন্য দুই খানি জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এইজন্য

পর্ত্তুগীজদিগের আগমন

খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার

ওলন্দাজদের আগমন ও এ্যাডামসের কথা



ওসাকা প্রাসাদ।

জাপান—পৃঃ ৬৯।

ওসাকা প্রাসাদে লইয়া গিয়া তখনকার শোগান, ইয়েউস্ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও আদর যত্ন করেন। এ্যাডামসকে যথেষ্ট ধনরত্ন দেন। ইহার পরে এ্যাডামস্ জাপানে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। জাপানে তিনি ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া বাস করেন। ইনি সামুরাইএর পদবী ও সম্মান প্রাপ্ত হ'ন। পরে জাপানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রথম ওলন্দাজ ও ইংরাজ কুঠি

১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা হিরাদোর কাছে একটি কুঠি খুলিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদের উহার কাছে একটি কুঠি খুলিবার অনুমতি দেওয়া হয়।

ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে হইতে স্পেনদেশীয় প্রচারক-গণ জাপানে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিতেছিলেন। তাঁহারা জাপানে আসিয়া এক অনর্থ বাঁধাইলেন। তাঁহাদের উদ্ধত ব্যবহারে জাপানীরা বড়ই বিরক্ত হইল।

জাপানের ইউরোপ বিদ্বেষ

ক্রমে জাপানীদের বিশ্বাস জাগিল যে ধর্ম্ম-প্রচার কেবল ব্যবসা চালাইবার ও নিজেদের রাষ্ট্রীয়

শক্তির বা জাতীয় আধিপত্য বিস্তারের এক ছলনা মাত্র। তখন জাপানীরা খ্রীষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী ও ইউরোপীয়দের উপর চটিয়া গেল। ক্রমশঃ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর দারুণ অত্যাচার আরম্ভ হইল। কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি জাপানী কি বিদেশী খ্রীষ্টান মাত্রেরই জীবন সংশয় হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে হতভাগ্য খ্রীষ্টানের রক্তে জাপান ভিজিয়া উঠিল। জাপানীরা কত লোককে জীবন্তে পোড়াইয়া মারিল। কত নিরাপরাধী ব্যক্তিকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া মারিল। কত লোক কত প্রকার নিষ্ঠুর অত্যাচারে প্রাণ হারাইল। ক্রমশঃ জাপান হইতে খ্রীষ্টধর্ম্ম লোপ পাইল আর সেই সঙ্গে সঙ্গে জাপানের সঙ্গে ইউরোপের ব্যবসা উঠিয়া গেল। যদি কোন ইউরোপবাসী জাপানে পদার্পণ করিতেন কিংবা কোন জাপানী বিদেশে যাইত তবে তাহার মৃত্যু দণ্ড হইত। কিন্তু এই নিষ্ঠুর আইনের বাহিরে ছিল একমাত্র ওলন্দাজেরা।

খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচার

ওলন্দাজেরা পর্ত্তুগীজ ও স্পেনদেশবাসীদের ঘৃণা করিত তাহাদের ধর্ম্মও তাহারা বিদ্বেষের চক্ষে দেখিত।

ব্যবসা বাণিজ্য লইয়াও রেষারেষি ছিল। ওলন্দাজেরা তাহাদের এই পুরাতন শত্রু দমন করিবার জন্য নানা প্রকার ঘৃণিত কার্য্যে লিপ্ত হইতে লাগিল। তাহারা জাপানীদের পূর্ব্বোক্ত নানারূপ নিষ্ঠুর কার্য্যে উৎসাহ দিতে লাগিল। এমন কি ইঁহারা একবার একখানা চিত্র জাল করিয়া শোগানকে দেখায় যে তাঁহাকে খুন করিবার জন্য এক বড় ষড়যন্ত্র চলিতেছে। যে সমস্ত খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী জাপানী পর্ত্তুগীজ ও স্পেনীশদের সঙ্গে ব্যবসা করিত ঐ পত্রে তাহাদের নাম ছিল। পরে ঐ সমস্ত জাপানীদের নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়। এই সমস্ত কারণে নাগাসাকী বন্দরের কাছে দেসিমা নামে ছোট একটি স্থানে ওলন্দাজদের ব্যবসা করিতে দেওয়া হইল।

ওলন্দাজের ষড়যন্ত্র

ওলন্দাজেরা এইরূপ নানা হীন চাতুরীর দ্বারা জাপানে ব্যবসা অধিকার পাইল বটে, কিন্তু ব্যবসার জন্য তাহাদের যথেষ্ট অপমান স্বীকার করিতে হইত। সর্ব্বদা তাহাদের

জাপানের সঙ্গে ওলন্দাজদের ব্যবসা বাণিজ্য

একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে থাকিতে হইত। অনেক সময় নিজেদের ধর্ম্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হইত। এমন কি কেহ মরিলে জাপানে কবর দিবার পর্য্যন্ত অনুমতি ছিল না। কিন্তু এ সমস্ত কষ্ট সহ্য করিয়াও ওলন্দাজেরা প্রতিবৎসর বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করিত। প্রতিবৎসর জাপান হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার বহুমূল্য মণিমুক্তা লইয়া যাইত। আজও তাহাদের দেশে এই সব বহুমূল্য রত্নাদি রহিয়াছে। কিন্তু এইরূপ কড়া আইনের ফলে জাপানের যথেষ্ট ক্ষতি হইল। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় তাহাদের জাতীয় জীবন ক্রমে মন্দ ও অসাড় হইয়া পড়িল। তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্য সবই নষ্ট হইয়া গেল। সমুদ্রগমনোপযোগী জাহাজ নির্ম্মাণ করা আইন বিরুদ্ধ হওয়ায় জাপানীরা এককালে যে খুব সাহসী ও সুদক্ষ নাবিক ছিল সে কথা অতীতের স্মৃতি হইয়া দাঁড়াইল। তাদের জীবনে আর যেন কোন উৎসাহ বা বৈচিত্র্য রহিল না, নিতান্ত একঘেয়ে ভাবে চলিতে লাগিল। ক্রমে তারা সব বিষয়ে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। দেশে জ্ঞানের আলো প্রায় নিবিয়া গেল। সাহস,

বীরত্ব তাও দীর্ঘকাল শান্তির ফলে হ্রাস পাইল। নানারূপ কুসংস্কারে দেশটি ছাইয়া গেল। এইভাবে দু'শো বছরের উপর কাটিয়া গেল। এমন সময় হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটে আর ঐ ঘটনা হইতে তাদের জাতীয় জীবন নূতন উৎসাহে নূতন পথে ছুটিয়া চলিল। জাপান গগনে প্রকৃত পক্ষে নূতন উষার উদয় হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

নবীন জাপান

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই প্রভাতে, কমোডোর পেরী, যখন তাঁহার রণতরী লইয়া জাপানের উপকূলে উপস্থিত হইলেন, জাপানের ইতিহাসে সেই এক চিরস্মরণীয় দিন। সে দিন উষার সঙ্গে সঙ্গে যেন অলক্ষ্যে জাপানের নব যুগের উদয় হইল। আজ তাহার মধ্যাহ্ন প্রভায় জাপানীরা জগৎকে চমকিত করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জাপানীরা কোন বিদেশীকে

জাপানে আসিতে দিত না, আর আসিলেই তার প্রাণদণ্ড হইত। ইহাতে এমেরিকা ও ইউরোপের অনেক সময় যথেষ্ট অসুবিধা হইত। যদি কোন

কমোডোরপেরীর আগমনের কারণ

জাহাজ জাপানসমুদ্রে ডুবিয়া যাইত বা ভগ্ন হইত তবে বিপন্ন যাত্রি বা নাবিক কেহই জাপানে আশ্রয় লইতে পারিত না। প্রাণ বাঁচাইবার জন্যে জাপানে উঠিলেই তার প্রাণদণ্ড হইত। কয়লা বা পানীয় জল ফুরাইয়া গেলে, জাপানের কোন বন্দরে জাহাজ লাগাইয়া জল বা কয়লা লইবার হুকুম ছিল না। এমনকি জলমগ্ন জাপানী-দের অন্যদেশের জাহাজ উদ্ধার করিয়া থাকিলে সে জাপানীদেরও জাপানে নামিতে দেওয়া হইত না! কেবল মাত্র ওলান্দাজদের জাহাজ জাপানে ভিড়িতে পারিত। আর প্রতিবেশী চীনদের সঙ্গে জাপানের অনেককাল হইতে ব্যবসা বাণিজ্য ছিল বলিয়া চীনের জাহাজ জাপানী বন্দরে আশ্রয় পাইত। এসব কারণে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি জাপান সম্রাটকে একখানি চিঠি লিখেন। ঐ চিঠিতে তিনি

জানিতে চাহেন, যে মার্কীন জাহাজ সময় অসময়ে জাপান বন্দরে আশ্রয় পাইবে কিনা; আর জাপান এমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য করিতে ইচ্ছুক কিনা? যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধি-স্বরূপ, কমোডোরপেরী এই চিঠি লইয়া যাত্রা করিলেন। তিনি আসিবার সময় সঙ্গে করিয়া কয়েকখানি যুদ্ধের জাহাজ লইয়া আসিলেন। কারণ কাজটা যদি নেহাৎ মিষ্টি কথায় না হয় তবে একটু চোখ রাঙ্গাইতে হইবে। বিশেষতঃ এমেরিকা পূর্ব্বে আর দুইবার দুইখানি জাহাজ পাঠাইয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে।

পেরীর আগমন

কমোডোরপেরী যখন তাঁহার জাহাজগুলি লইয়া জাপানের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন জাপানীরা তাঁহাকে বাধা দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি বাধা মানিলেন না। পেরী ৮ই জুলাই প্রভাতে ইদ্‌সূ অন্তরীপে উপস্থিত হইয়া ক্রমে বন্দরের দিকে অগ্রসর হইলেন। জাপানীরা আর একবার বাধা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। অবশেষে পেরী ওরাকোরা সহরের সম্মুখে আসিয়া নঙ্গর করিলেন। জাহাজগুলি যেমন নঙ্গর ফেলিল

অমনি জাপানীরা কয়েকটি বন্দুকের আওয়াজ করিল ; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে চার পাঁচখানি ছিপের মত নৌকা ভাসাইয়া কতকগুলি বলিষ্ঠ জাপানী উল্লাসে জাহাজের দিকে বাহিয়া আসিতে লাগিল। জাহাজগুলি তীর হইতে মোটে এক মাইল দূরে ছিল। ঐ নৌকায় সহর কোতোয়ালের অধীনস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। ঐ কর্ম্মচারী পেরীর সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলে পেরী তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দিলেন। ওলান্দাজ দ্বৈভাষিক জাপানীদের বুঝাইয়া দিল যে এমেরিকা-যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার তাহারা উপযুক্ত নয়। পেরী জাপানী কর্ম্মচারীকে জানাইলেন যে তিনি সম্রাটের কাছে চিঠি লইয়া আসিয়াছেন, রাজার উপযুক্ত প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কাহারও কাছে দিবেন না। আর চিঠি না দেওয়া পর্য্যন্ত তিনি এখানেই আছেন। জাপানীরা তাঁহাকে ঐ চিঠি লইয়া নাগাসাকী যাইতে বলিল, কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। পেরীর ব্যবহারে জাপানীরা একটু ভীত হইল। তাহারা তীরে সারারাত আগুন জ্বালিয়া পাহারা দিল ; আর

বিস্ময়ের চোখে পেরীর অস্ত্র শস্ত্র সুশোভিত যুদ্ধের জাহাজগুলি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

পেরীর অভ্যর্থনা

অবশেষে, চারদিন পরে, পেরীকে জাপানী কর্ম্মচারী আসিয়া জানাইল যে তাঁহার চিঠি লইবার জন্য, সম্রাট তাঁহার প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন। প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে সহরের দুই মাইল দক্ষিণে একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে পেরী তাহার জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। আর তাঁহার জাহাজ কয়খানি তীরের দিকে কামানের মুখগুলি ফিরাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল, অর্থাৎ দরকার হইলেই গুলি চালাইবে। জাপানীরা খুব ধূম ধামের সঙ্গে পেরীকে অভ্যর্থনা করিল। পেরীর অভ্যর্থনার জন্য বিচিত্র কারুকার্য্য শোভিত একটি সুন্দর বস্ত্রমণ্ডপ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। পেরী শিবিরে উপস্থিত হইয়া যথারীতি অভিবাদনের পরে সোনার বাক্স হইতে যুক্তরাজ্যের সভাপতির চিঠিখানি ও অন্যান্য উপঢৌকন দিলেন। সম্রাটের প্রতিনিধিদ্বয়

তাহা সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে তিনি এই পত্রের উত্তর যথাসময়ে ওলন্দাজ বা চীনের মারফৎ পাইবেন, তবে একটু দেরী হইবে। পেরী বলিলেন যে তিনি জবাবের জন্য ঠিক এপ্রেল বা মে মাসে ফিরিয়া আসিবেন। একথায় জনৈক কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সব জাহাজ লইয়া আসিবেন কি ?" পেরী উত্তর করিলেন, "নিশ্চয়। আবশ্যক হইলে আরও বেশী আনিতে পারি।" ইহার পর পেরী জাপানী কর্ম্মচারীদের তাঁহার জাহাজে নিমন্ত্রণ করিলেন। জাপনীরা আসিয়া খুব আনন্দেপান আহার করিয়া গেল। এইভাবে পেরীর প্রথম জাপান অভিযান শেষ হইল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী কমোডোরপেরী আবার তাঁহার জাহাজগুলি লইয়া উপস্থিত হইলেন। এবার তিনি একেবারে ইডোর উপকূলে শোগানদের অবরুদ্ধ দ্বারে আসিয়া ধাক্কা মারিলেন। জাপানীরা তাঁহাকে আর ফিরাইতে সাহস পাইল না। এবার পেরীর সঙ্গে আরও দুই একখানি জাহাজ বেশী ছিল। জাপানীরা এবারও খুব ধূম ধামের সঙ্গে পেরীকে অভ্যর্থনা করিল।

তুইকাতারে সশস্ত্র জাপানী সৈন্য তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিল। পেরীর অভ্যর্থনার জন্যে একটি সুন্দর বাড়ী তৈয়ারী হইল। সেখানে গণ্য মান্য উচ্চপদস্থ জাপানীর সঙ্গে পেরী সন্ধির কথা বার্ত্তার আলোচনা করিলেন। অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর জাপানীরা এমেরিকার যুক্তরাজ্যের সঙ্গে সন্ধি করিল। এতদিনে জাপানের অবরুদ্ধ দ্বার মুক্ত হইল।

এমেরিকার সঙ্গে জাপানের সন্ধি

পেরীর আগমনের পর হইতে জাপানীদের নিজেদের সম্বন্ধে জ্ঞানোদয় হইল। জাপানীরা দেখিল, তাহারা কোন পরাক্রান্ত বিদেশী শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে নিতান্ত অক্ষম। বর্ত্তমান যুগের অস্ত্র শস্ত্র তাহাদের কিছুই নাই। তাহাদের সৈন্য সামন্ত সবই সেকেলে ধরণের। জাপানের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে সৈন্য সামন্তের প্রথম সংস্কার প্রয়োজন। আর পাশ্চাত্য জগৎ হইতে একেবারে দূরে থাকিলে এইগুলির উন্নতি সাধন কঠিন,

পেরীর আগমনের ফলে জাতীয় জাগরণ

কারণ আজ ইউরোপ এমেরিকা জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভায় নব বলে বলীয়ান। ইহাদের কাছে শিখিবার অনেক আছে। জাপানীরা দেখিল যে তাহারা চিরকাল তাহাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে পারিবে না,তাহাকে একদিন না একদিন কাহারও না কাহারও সংস্পর্শে আসিতে হইবে, আর তখন সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়াও বিচিত্র নয়। তাই জাপানীরা নিজের পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল। জাপানের ব্যবসা বাণিজ্য প্রায় লোপ পাইয়াছে ; এমন কি জাপানের যে গর্ব্ব চারুশিল্প তারও নিতান্ত দুরাবস্থা। জাপানীরা সহজে তাহাদের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিল। তাহারা দেখিল যে তাহাদের বড হইতে হইবে, তাহাদের আপন জাতির মর্য্যাদা, স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইবে। আর জাপানীরা দেখিল যে এজন্য তাহাদের পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে। তাহাদের আইন কানুন অনেক বদলাইতে হইবে। তাহাদের অনেক সামাজিক আচার ব্যবহারের সংস্কার করিতে হইবে। তাহাদের অনেক বিষয়ে অনেক পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

তোরজোরিওর কথা।

জাপানের এই জাতীয় দুর্ব্বলতার অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জাতীয় শক্তি জাগিয়া উঠিল। তাহাদের জাতীয় [illegible] পথে যেগুলি বাধা সেইগুলি দূর করিবার জন্য জাপানীরা বদ্ধ পরিকর হইল। তখন দলে দলে জাপানী পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান লাভের আশায় ছুটিয়া আসিল। পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার জন্য জাপানের নানা স্থানে স্কুল খোলা হইল। জাপানীরা জাতীয় সংস্কারের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এই সময় কয়েকজন প্রাতঃস্মরণীয় জাপানী যুবক নিজের দেশবাসীকে নানারূপ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সেই নিঃস্বার্থ দেশ-সেবকদিগের মধ্যে ওসীদা তোরজোরিওর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার করিতে গিয়া যথেষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করেন। ইটালী দেশের গেলিলিও যেমন বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রচার করিতে গিয়া কারারুদ্ধ হয়েন, তোরজোরিও সেইরূপ পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার জন্য কারাগারে যথেষ্ট নির্য্যাতন ভোগ করেন। দেশের লোককে তাহাদের নিজের দুরাবস্থার কথা স্মরণ

করাইয়া তিনি তাহাদের প্রতিকার করিতে বলেন। তিনি জাপানীদের বুঝাইয়া দেন যে জাপানের উন্নতির পথে প্রথম বাধা জাপানের বর্ত্তমান শাসন-প্রথা। আর যতদিন জাপানে এই শোগানদের শাসন-পদ্ধতি থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত জাপানের জাতীয় সংস্কার অসম্ভব। জাপানে একটি রাজশক্তির অভাবে দেশে বিস্তর অমঙ্গল ঘটিয়াছে। এই সমস্ত কথা প্রচার করার জন্য তাঁহাকে অনেকবার জেলে যাইতে হয়। কিন্তু যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে সেই তাঁহার মতাবলম্বী হইয়াছে। এমন কি জেলের প্রহরী, কারাগারের রক্ষক সকলেই তাঁর মন্ত্রশিষ্য হইল। তিনি যে জেলে যাইতেন সেখানকার জেলের কর্ত্তা হইতে প্রহরী পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। অবশেষে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। মৃত্যুর সময়েও তোরজোরিও দেশের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। সে কথা আমরা এই বইএর প্রথমেই বলিয়াছি। এই জাতীয় অভ্যুত্থানের যুগে, একা তোরিজো নহেন, তাঁহার ন্যায় আরও অনেক স্বার্থত্যাগী, স্বদেশভক্ত জাপানী যুবক অগ্রসর হইলেন, তাঁহাদের এক প্রতিজ্ঞা,

একপণ,—হয় জাপানের উন্নতি সাধন—নতুবা মৃত্যু। তাঁহাদের সেই একনিষ্ঠ সাধনা ব্যর্থ হয় নাই।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

জাপানের অভ্যুত্থান

জাপানীরা তাহাদের জাতীয় জীবন সংস্কার করিতে গিয়া প্রথমেই দেখিল যে শোগান শাসন-প্রণালী তাহাদের উন্নতির পথে প্রকাণ্ড অন্তরায়। শোগান-দিগের অত্যাচারে দেশের অবস্থা নিতান্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রায় লোপ পাইয়াছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। অথচ বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতি থাকিলে ইহার প্রতিবিধান অসম্ভব, কারণ দেশের যাহারা গণ্যমান্য

তাঁহারা সকলেই শোগানদের আজ্ঞাবহ। শোগানেরা ছিলেন স্বার্থের দাস। তাঁহারা নিজের স্বার্থ, নিজের প্রভুত্বই খুঁজিতেন ; দেশের মঙ্গলের দিকে তাঁহাদের কোন লক্ষ্যই ছিল না। তাঁহারা নিজেদের ক্ষমতা অটুট্ রাখিবার জন্য ছল, বল প্রয়োগেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এইজন্য তাঁহাদের অনেক লোকজন রাখিতে হইত। তবে তাঁহাদের প্রধান সম্বল ছিল বেতনভোগী সৈন্য। সকলকেই কিছু না কিছু সৈন্য রাখিতে হইত। আবার তাঁহারা নিজেরা কিন্তু তাঁহাদের আশ্রয়স্থল এই সৈন্যদের ভয়ে ভীত থাকিতেন। সর্ব্বদা তাহাদের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিতেন।' আর ঐ সমস্ত সৈন্য ছিল সামুরাই সম্প্রদায়ের লোক। শোগানেরা নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বড় বড় জমিদার, দেশের গণ্যমান্য লোক, জেলার কর্ত্তা, সকলকেই হাতে রাখিতে চাহিতেন। এই সামুরাই সম্প্রদায়ই ছিল তাদের ক্ষমতা ও উচ্চপদের ভিত্তি। তাই তাহারা সকলে মিলিয়া এই সামুরাইদের সন্তোষ সাধন করিতে চাহিতেন। ফলে জায়গা জমি তাহারাই ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইত। শাসন কার্য্যে ও সামরিক

বিভাগে একমাত্র তাহাদেরই স্থান, অন্য শ্রেণীর জাপানীরা অনেক দূরে পড়িয়া থাকে। জাপানীরা দেখিল তাহাদের এই সামুরাই সম্প্রদায়ের সংস্কার প্রয়োজন। তাহাদের এই যে সামাজিক ও রাজনৈতিক কতগুলি সুযোগ, সুবিধা ও সম্মান দেওয়া হয়, তাহা সকল শ্রেণীর জাপানীরই প্রাপ্য। যোদ্ধা বা সামুরাইএরা জাপানে ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিল। জমিদার ছিল জমির মালিক, আর তাঁহার অধীনস্থ সামুরাইগণ একমাত্র তাঁর বশ্যতা স্বীকার করিবে। এই ভূমিস্বত্ব ও প্রজাবিলির আইন ও প্রথার সংস্কার দরকার। কারণ ইহাতে দেশের একতা ও শাসন কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে। রাজাই জমির প্রকৃত মালিক, জমিদার ও তাঁহার অধীনস্থ সকলেই রাজার আদেশ পালন করিতে বাধ্য। সুতরাং সামুরাই সম্প্রদায়ের সংস্কার করিতে গেলেই ভূমিস্বত্ব আইনের সংস্কার ও সেই সঙ্গে সঙ্গে শোগান-শাসন

সামুরাই সম্প্রদায়ের সংস্কার

প্রাচীন শাসন প্রণালী ও ভূমিসত্ব প্রচার সংস্কার প্রস্তাব

প্রণালীর সংস্কার আবশ্যক। আর শাসন পদ্ধতির সংস্কার না হইলে দেশের কোন বিষয়ে প্রকৃত সংস্কার ও মঙ্গল হইবে না, অথচ জাপানের প্রত্যেক বিভাগে সংস্কার একান্ত আবশ্যক। আর কোথায় না সংস্কারের প্রয়োজন? দেশ আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ. তাহার সামরিক, বাণিজ্য ও বিচার বিভাগের সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। তাহার রাজনীতি দণ্ডনীতি, কারাগার, পুলীশ, সর্ব্বত্র উচ্ছৃঙ্খলা, সর্ব্বত্র সমস্ত জিনিষের আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। স্বদেশপ্রেমিক জাপানীরা এই সবগুলি সংস্কার করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। তাহারা দেখিল

অন্যান্য বিভাগের কথা

যে যতদিন এগুলির উন্নতি সাধিত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত জাপানের প্রকৃত উন্নতির কোন আশাই নাই। তখন জাপানীরা দলবদ্ধ হইয়া শোগানদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। কামোডোর পেরীর আগমনে জাপানীরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে জাপানের মধ্যে শোগান যতই ক্ষমতাশালী হউন না কেন প্রকৃতপক্ষে তিনি দুর্ব্বল। তিনি শত্রুর আক্রমণ হইতে জাপান রক্ষা করিতে নিতান্ত অক্ষম।

দেশে তখন বিপ্লব আরম্ভ হইল। এই বিপ্লবের ফলে বর্ত্তমান বা নূতন জাপানের অভ্যুত্থান। এই জাতীয় জাগরণের দিনে যে সমস্ত জাপানী দেশের কার্য্যে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জাপানের বর্ত্তমান উন্নতি ঘটিয়াছে, তাঁহাদের নাম জাতীয় ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে।

রাষ্ট্রবিপ্লব

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে এতবড় জাতীয় বিপ্লবটা প্রকৃতপক্ষে মাত্র ৫৫ জন জাপানী মিলিয়া সম্পন্ন করেন। ইহাদের মধ্যে পাঁচজন শক্তিশালী বড় জমিদার, আটজন শোগান দরবারের দরিদ্র পারিষদ, আর বক্রী ৪২ জন জাপানী যুবক। বিপ্লবের প্রথম ধাক্কাতেই শোগানেরা ভাসিয়া গেল। তাঁহাদের অতুল বৈভব, বিখ্যাত ওসাকা প্রাসাদ সবই চলিয়া গেল। আর ঐ সময় ইটাগকী (Itagaki) নামে একজন জাপানী মনীষী জাপানীদের প্রজাতন্ত্রের কথা শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, দেশের শাসন দেশের দশ জনের হাতে

৮

থাকা উচিত। দশের ইচ্ছানুসারেই দেশের শাসন হওয়া উচিৎ। এই জন্য লোকে তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে। শাসনভার প্রজার হাতে থাকিলে আর রাজায় প্রজায় কখনও গোলযোগ উপস্থিত ইহবে না। কিন্তু রাজভক্ত জাপানীগণ তাহাদের রাজাকে ভুলিল না. ধুমধামের সঙ্গে তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইল। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে ইডো নগরে জাপান সম্রাট একান্ত তরুণ বয়সে জাতীয় উৎসব ও জাগরণের মধ্যে সিংহাসন আরোহণ করিলেন। এই ইডোই বর্ত্তমান জাপানের রাজধানী টোকিও। আর সেই দিন হইতে জাপানের ভাগ্যলক্ষ্মীর উদয় হইল। সমগ্র জাপান নূতন জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বিপ্লবের পরেই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করিয়া, রাজাকে সিংহাসনে বসাইয়া, জাপানীরা প্রকৃত রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিল। যাঁহাকে জাপানবাসী মাত্রেই ভক্তি করে ও মানে তাঁহাকে সিংহাসনে বসানোতে কাহারও আর আপত্তির কারণ রহিল না। নতুবা জাপানের উদ্ধত সামুরাই জমিদারগণ অপর কাহারও বশ্যতা স্বীকার

করিত কিনা সন্দেহ। সম্ভবতঃ বহুদিন ধরিয়া রাষ্ট্রবিপ্লব চলিতে থাকিত। কিন্তু জাপানের প্রকৃত রাজাকে আবার পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া তাহারা শান্ত রহিলেন। বিখ্যাত সাৎসুমা, চোশীউ, ধোসা ও হিজেন বংশীয় জমিদারগণ একমাত্র স্বদেশপ্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের জমিদারি রাজাকে সমর্পণ করিলেন এবং ঐ দিন হইতে জাপানের প্রাচীন ভূমিসত্ব প্রথা বা ফিউডেলইজম্ দূর হইল। শোগানেরা দূর হইবামাত্র, সঙ্গে সঙ্গে এইরূপে পূর্ব্বের ভূমিসত্ব প্রথা উঠিয়া গেল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে সামুরাই সম্প্রদায়েরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিল। এক্ষণে সমাজে, ও শাসন কার্য্যে অন্যান্য জাপানীদের সামুরাইদের মতন অধিকার জন্মিল। অনেক দিন পরে জাপানে আবার একজন মাত্র সর্ব্বোপরি কর্ত্তা হইলেন। ইহার ফলে সমস্ত জাপান এক শাসনাধীন হইল। একই রকম আইন কানুন সর্ব্বত্র জারি হইল। ইহার দ্বারা সহজেই জাপানীদের মধ্যে একতা ফিরিয়া আসিল এবং রাজশক্তি একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় রাষ্ট্রশক্তিও বাড়িয়া উঠিল।

শাসন কার্য্যে সহজেই সুশৃঙ্খলা আনা সম্ভব হইল। ক্রমে তখন আইন কানুন, আচার ব্যবহার ও নানাপ্রকার সরকারি বিভাগে সংস্কার আরম্ভ হইল। ফলে জাপানের সামরিক বিভাগ, রাজস্ব, শাসন-পদ্ধতি, বিচার, আচার, দণ্ডনীতি, কারাগার সমস্তই আমূল পরিবর্ত্তিত হইল। জাপানীদের জাতীয় উন্নতির যুগের উদয় হইল।

অতুল সাহসী কমোডোর পেরী যে দিন অপূর্ব্ব কৌশলে, বিনা রক্তপাতে জাপানের চির-অবরুদ্ধ দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন, সেদিন হইতে জাপানের বহির্নীতি পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইল। জাপান ক্রমে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিল, ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গেও ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে সন্ধি হইল। আর ঐ মুক্ত দ্বার দিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো জাপানে ছড়াইয়া পড়িল। আর ঐ আলোকে জাপানের শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান দিন দিন পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। তার গৃহে গৃহে শিল্পের চর্চ্চা, কারখানায় কারখানায় কামান বন্দুক; বন্দরে বন্দরে বড় বড় জাহাজ তৈয়ারী হইতে লাগিল।

যেন একটা নবীন জীবনের সাড়ায় সমস্ত জাপান শতাব্দীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

সম্রাট অধীনে নবীন জাপান

১৫ বৎসরের সম্রাট মুৎসুহিতু সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ঘোষণা করিলেন, যে, দেশে প্রাচীন কালের যে সমস্ত বর্ব্বরোচিত আইন কানুন ও কুসংস্কার পূর্ণ আচার ব্যবহার আছে, তাহা সমস্ত দূর করা হইবে। আর জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারা যাহাতে রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়, সর্ব্বদা সে বিষয়ে যত্ন করা হইবে। জাপানীদের অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে সম্রাটের এই ঘোষণা তাঁহার জীবদ্দশাই সার্থক হইয়াছে। জাপানের প্রত্যেক মঙ্গলকর কার্য্যে রাজা যোগদান করিলেন। রাজার উৎসাহ পাইয়া জাপানীদের আগ্রহ আরও বাড়িয়া উঠিল। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্যে বড় বড় বিদ্যালয় খোলা হইল। দেশে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ বসানো হইল। নানা স্থানে

বড় বড় কারখানা খোলা হইল। জাপানীরা নিজেদের টাকশাল, বিদ্যালয় স্থাপন করিল। ইউরোপের অনুকরণে জাপানী রণতরী নির্ম্মাণ হইল। আর কারখানায় কারখানায় নানারূপ অস্ত্র শস্ত্র তৈয়ারী হইতে আরম্ভ হইল। এদিকে জাপানী যুবকেরা নবীন উৎসাহে কুচ কাওয়াজ আরম্ভ করিল। আর মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্যে, দলে দলে নাবিক ও সৈনিক হইতে লাগিল। জাপানের এই পুনর্জ্জীবনের কাহিনী, আরব্য উপন্যাসের আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মতই বিস্ময়কর; যেন এক মুহূর্ত্তে সমস্ত অসম্ভব সম্ভব হইয়া গেল। আর এই যাদুকরদিগের মধ্যে সকলেই প্রায় তরুণ বয়স্ক যুবক। অসাধারণ তেজস্বী ও ধীশক্তি সম্পন্ন যুবক জাপানের প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই দেখা দিল। একটা জাতি একটা উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনাদের একাগ্রতা একনিষ্ঠতা ও অধ্যবসায়ের ফলে কতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারে, জাপান তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। জাপানীদের এই পাশ্চাত্যের অনুকরণফলে তাদের অনেকগুলি আচার

নীতি ইউরোপেরই অনুরূপ হইয়া পড়িল। এমন কি পোষাক পরিচ্ছদ ও পাশ্চাত্য ধরণের হইয়া উঠিল। কিন্তু অনুকরণের প্রথম বেগটা কাটিয়া গেলে জাপানীরা আবার সব বিষয়ে তাদের নিজস্বটুকু বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এত সামান্য সময়ের মধ্যে এরূপ অপূর্ব্ব উন্নতি দেখিয়া ইউরোপ চমকিত হইল।

কিন্তু এই উন্নতির মূলে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি, দুইই ছিল বলিয়া এত সহজে ও এত অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব হইল। প্রজার যাহাতে মঙ্গল রাজা সেই দিকে যত্নবান হইলেন, আর প্রজাও রাজ্যের যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হয় সেই দিকে চেষ্টা করিতে লাগিল। জাপানীদের রাজভক্তি অত্যন্ত গভীর, তাহারা তাদের মিকাডো বা সম্রাটকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে জাপানী সভ্যতার মূলে এই রাজভক্তি বিশেষভাবে বিদ্যমান। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জাপান সম্রাট জাপানের প্রথম রাষ্ট্রীয় মহাসভা বা পার্লামেণ্ট আহ্বান করেন; সেই দিন হইতে শাসনভার জাপানী জনসাধারণের হাতে আসিল। রাজা এই মহা মণ্ডলীর উপদেশ ও ইচ্ছানুসারে রাজ্য শাসন করেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

কোরিয়া জয়

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পরে কর্‌মোজা ও রুইকো দ্বীপের অধিকার ও সত্ব লইয়া চীনের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ হয়, তবে কোন বারই তেমন গুরুতর হয় না। কিন্তু এবার কোরিয়া লইয়া ঘোর যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল।

চীনের সঙ্গে যুদ্ধের কারণ

প্রথমে জাপান সাম্রাজ্ঞী জিঙ্গো, ও পরে হিদীওশী কোরিয়া জয় করায়, জাপানীরা কোরিয়াকে তাহাদেরই অধীন রাজ্য মনে করিত, আর কোরিয়ানগণও এতদিন পর্য্যন্ত জাপানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু শোগানদের আধিপত্য দূরে হইতে দেখিয়া ও জাপানীদের মধ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটায়, জাপানীদের দুর্ব্বল মনে করিয়া কোরিয়ানগণ অবাধ্য হইয়া উঠিল। ইহার তলে তলে চীনের উত্তেজনা ছিল।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ায় একটি বড় রকম বিদ্রোহ ঘটে। কোরিয়ার সরকার সেই বিদ্রোহ দমন করিতে না

পারিয়া, চীনের সাহায্য প্রার্থনা করিল। চীন সোৎসাহে তার সৈন্য সামন্ত কোরিয়ায় পাঠাইল, চীনের মতলব ছিল যে এই সুযোগ কোরিয়ায় জাপানের আধিপত্য দূর করিবে; তখন জাপানীরা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কারণ ইহার পূর্ব্বে একটি ঘটনায় চীনের উপর জাপানের সন্দেহ জন্মে। সেটি এই। কোরিয়ার উন্নতি অভিলাষী সম্প্রদায়ের নেতা কীম-ওক-ক্যন্ শত্রুর ভয়ে জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে সেইখানেও তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার প্রাণবধ করিতে চেষ্টা করিলে, তিনি সেংঘাইতে একটি জাপানী হোটেলে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেইখানে তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। চীনেরা হত্যা-কারীকে শাস্তি না দিয়া, সেই হত্যাকারীকে কীমের মৃতদেহের সঙ্গে সসম্মানে তাহাদের যুদ্ধের জাহাজে পাঠাইয়া দিল। তাই চীনেরা যখন তাহাদের সৈন্য সামন্ত কোরিয়ায় পাঠাইল, জাপানীদের মনে সহজেই বিশ্বাস হইল, যে ইহাতে চীনের দুরভিসন্ধি আছে। আর সম্বন্ধে একটা জাপানের নিজের স্বাধীনতা ও নিরাপদের জন্য কোরিয়ার মীমাংসা করা দরকার। কারণ কোরিয়া

উপদ্বীপটি জাপান হইতে পৃথক হইলেও জাপানের ঠিক মাথার উপরে। দুর্ব্বল কোরিয়ার পক্ষে তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করা অসম্ভব, সে সহজেই কোন বলবান জাতির হস্তগত হইবে। আর তখন সেই জাতির সঙ্গে জাপানের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তখন সেই জাতির সঙ্গে জাপানের পারিয়া উঠা কঠিন, কারণ তখন কোরিয়া তার হাতে থাকিবে। সুতরাং কোরিয়া যদি চীনের হাতে থাকে তবে জাপানের যথেষ্ট অসুবিধা ঘটিবে, জাপানীরা তাই চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইল।

দুই দলে অনেক যুদ্ধ হইল, কিন্তু প্রত্যেক যুদ্ধেই জাপানীরা জিতিতে লাগিল। অবশেষে ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ফিওঙ্গইয়াঙ্গে একটি রক্তাক্ত যুদ্ধে জাপানীরা চীনদের পরাস্ত করিল, আর তার পরদিনই ইয়ালু নদীর মুখে একটি প্রকাণ্ড জলযুদ্ধে চীনেরা হারিয়া গেল।

জাপানের জয়

পরে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সঙ্গে জাপানের এক সন্ধি হয় ইহাতে কোরিয়ার স্বাধীনতা, ও মাঞ্চুরিয়ার

একাংশ জাপানকে দেওয়া হয়। কিন্তু এই সন্ধি পত্রের সর্ত্ত সম্বন্ধে রুষ, ফরাসী ও জার্ম্মানী বাধা দিল। তাহাতে জাপানকে মাঞ্চুরিয়া ছাড়িয়া দিতে হইল। সেদিন হইতে জাপান রাজনীতির ক্ষেত্রে ইউরোপকে সন্দেহের চোখে দেখিতে লাগিল। জাপানের আত্মমর্য্যাদায় বড় আঘাত লাগিল। জাপানীরা দেখিল,যে তাহারা ইউরোপের শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে না বলিয়া, আজ তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে তাহারা বঞ্চিত হইল। জাপানীরা মনে মনে স্থির করিল তাহারা একদিন ইউরোপকে দেখাইবে যে এসিয়াবাসীরা শক্তি সামর্থ্যে ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষ হইতে পারে। সেই দিন হইতে জাপানীরা তাহাদের সৈন্য সামন্ত বাড়াইতে লাগিল,পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে অদম্য উৎসাহে জাতীয় শক্তির সংগঠনে নিযুক্ত হইল।

চীনের সঙ্গে সন্ধি

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড জাপানের সঙ্গে সন্ধি করিল, ইহাতে পূর্ব্ব এসিয়া-খণ্ডে শান্তি রক্ষার জন্য উভয়েই প্রতিশ্রুত হইল। এই সময় হইতে জাপান ইউরোপীয় শক্তিশালী রাষ্ট্রমণ্ডলীব মধ্যে আসন পাইল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

রুষ জাপানের যুদ্ধ

টোকিওর রাজপথ দিয়া একটি ঘোড়া নক্ষত্র বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। ঘোড়ার উপর একজন জাপানী বসিয়া। অশ্বারোহী প্রাণপণ শক্তিতে লাগাম ধরিয়া টানিতে ছিল; কিন্তু ঘোড়া ক্ষেপিয়া যাওয়ায় কিছুতেই বাগে আনিতে পারিতেছিল না। তখন সে প্রাণভয়ে "রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু ঘোড়াটিকে তীরের মত ছুটিতে দেখিয়া সকলেই ভয়ে সরিয়া গেল। এমন সময় একটি জাপানী বালক হঠাৎ ঘোড়ার মুখের কাছে আসিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে তার লাগাম ধরিয়া ঘোড়াটিকে থামাইয়া ফেলিল। সেই অবসরে অশ্বারোহী ঘোড়ার পিঠ হইতে লাফাইয়া পড়িল। সকলে ঐ বালকের অপূর্ব্ব সাহস দেখিয়া বিস্মিত হইল। অশ্বারোহী বালককে মনে প্রাণে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

বীর বালক

ঐ নির্ভীক বালকটি কে জান? ইঁনিই রুষ বিজয়ী জাপানের বিখ্যাত নৌসেনাপতি এ্যাড্‌মিরেল টগো। ইংলণ্ডের নৌসেনাপতি লর্ড নেলসনের মত ইনি শৈশবাবধি ভয় কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রুষ, ফ্রান্স ও জার্ম্মানী, চীনের সঙ্গে জাপানের যে সন্ধি হয়েছিল সে সর্ত্ত অনুসারে কাজ হইতে দিল না। আর ঐ সুযোগে রুষিয়া পোর্টআর্থার দখল করিয়া বসিল। ক্রমে ক্রমে মাঞ্চুরিয়াও রুষিয়া টেলিগ্রাফ ও রেল বসাইতে অগ্রসর হইল। রুষিয়া বলিল যে এবিষয়ে তার অধিকার আছে, আর এজন্য সে চীনের অনুমতি পাইয়াছে। এই সময়ের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই রুষিয়া এসিয়াভূমিখণ্ডে তার রাজত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সুতরাং জাপানীদের ভয় হইল। জাপান দেখিল যে কোরিয়া যদি রুষিয়ার মত ইউরোপীয় কোন শক্তিশালী জাতির হাতে পড়ে তবে কিছুদিন পরে তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন

রুষ জাপান যুদ্ধের কারণ

হইবে। জাপান তাই প্রথমে রুষিয়ার সঙ্গে আপোষে মিটমাট করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রুষিয়া সে কথায় বড় একটা কান দিল না।

অবশেষে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী তারিখে জাপান রুষিয়া হইতে তার প্রতিনিধি সরাইয়া আনিল। পরদিন রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। আর ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লৌকিক প্রথানুসারে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া, জাপানীরা একেবারে পোর্ট আর্থার আক্রমণ করিয়া রুষিয়ার তিনখানা যুদ্ধের জাহাজ ডুবাইয়া দিল। তখন রুষ জাপানের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল।

যুদ্ধারম্ভ

এই যুদ্ধে প্রথম হইতেই জাপানীরা অপূর্ব্ব সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিল। আর যুদ্ধের প্রথম হইতেই রুষিয়ানেরা হারিতে আরম্ভ করিল।

জাপান-সেনাপতি নগী, ওকো, করুকী, ওয়ামা এই যুদ্ধে জাপান সৈন্য চালনা করিতে লাগিলেন। আর জাপানের নৌসেনার ভার এ্যাড্‌মিরেল টগোর হাতে দেওয়া হইল। এ্যাড্‌মিরেল টগো জল পথে রুষিয়ানদের



রুষ জাপানের যুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্য জাপানী রমণী কর্তৃক বিক্রয়ার্থে বেণীকর্ত্তন ।

জাপান ।

নাস্তা নাবুত করিতে লাগিলেন। আর স্থল পথে জাপানী সৈন্য রুষিয়ানদের ক্রমে কোরিয়া হইতে ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

২৬শ এপ্রেল তারিখে জাপান সেনাপতি (Karoki) করুকী, ইয়ালু (Yalu) নদীর তীরে রুষিয়ানদের আক্রমণ করেন। চারদিন ভীষণ যুদ্ধের পরে জাপানীরা রুষিয়ান সৈন্যের উপর সম্পূর্ণ জয় লাভ করিল। এই যুদ্ধের ফলে রুষিয়া কোরিয়া হইতে হাটিয়া আসিল। জাপানীরা তখন মাঞ্চুরিয়ায় ছাউনী করিল।

ইয়ালুর যুদ্ধ

৫ই মে তারিখে সেনাপতি ওকু (Oku) একটি রক্তাক্ত যুদ্ধে রুষ সৈন্য পরাস্ত করিয়া পুলানটিন্ দখল করেন। ইহার পর কিংচাউ, ডানলী দখল করিয়া, স্থলপথে পোর্ট আর্থারের সঙ্গে অন্য রুষিয়ানদের যোগদানের পথ বন্ধ করেন। আর এই দিকে জলপথে টগো রুষিয়ার রণতরীগুলিকে পোর্টআর্থারে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। এই ভাবে জাপানীরা জলে স্থলে পোর্টআর্থার অবরোধ করিল।

কিংচাউ দখল

১০ঐ আগষ্ট তারিখে রুষিয়ার ছোট বড় মিলাইয়া আঠারো খানি যুদ্ধের জাহাজ পোর্টআর্থার হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিল। জাপানীরা প্রথমে কোন বাধা দিল না, কিন্তু যেমন আসিয়া সমুদ্রের মুখে পড়িল, অমনি টগো সিংহ বিক্রমে আক্রমণ করিলেন। রুষিয়ার অনেকগুলি জাহাজ নষ্ট হইল, আর বাকিগুলি আবার পোর্টআর্থারে ফিরিয়া আসিল। ২৪শে আগষ্ট জাপান সেনাপতি ওয়ামা (Oyama) দুই লক্ষের উপর সৈন্য লইয়া রুষিয়ার প্রধান সেনাপতি ক্রপাট্কীনের অধীন বিপুল রুষবাহিনী আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে রুষিয়ানদের বিশ হাজারের উপর, ও জাপানীদের ১৭ হাজার লোক মারা যায়, যুদ্ধে ক্রপাট্কীন হাটিয়া আসিলেন।

পোর্টআর্থার অবরোধ

রুসসেনাপতি বিধ্বস্ত

এই সময় সেনাপতি নগী (Nogi) প্রায় এক লক্ষ জাপানী সৈন্য লইয়া পোর্ট আর্থার দখল করিতে অগ্রসর হন। এই যুদ্ধে জাপানীরা অতুল বিক্রম প্রকাশ করে, আর

পোর্টআর্থার দখল

তাদের অস্ত্র শস্ত্র যে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়, তাহা প্রমাণ হয়। এমন কি তখন জাপানীরা ধূমহীন বারুদ পর্য্যন্ত আবিস্কার করিয়াছিল। এই যুদ্ধে বিস্তর জাপানী প্রাণত্যাগ করে কিন্তু দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য কি করিয়া বীরের মত মরিতে হয় জাপানীরা তাহা সমগ্র জগৎকে দেখাইল। রুষিয়ান সেনাপতি ষ্টিসেল (Stœssal) যথেষ্ট বীরত্বের সঙ্গে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পোর্টআর্থার শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিলেন, কিন্তু যখন আর কোন সাহাব্য পাইলেন না তখন পোর্টআর্থার সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ২রা জানুয়ারী তারিখে আহত ও রুগ্ন লইয়া, প্রায় চল্লিশ হাজার লোক সহ রুষ সেনাপতি আত্ম-সমর্পণ করিলেন।

এমন সময় নৌসেনাপতি রুজ্‌বেজ্‌-ভেস্কীর (Rojestvensky) অধীনে রুষিয়ানেরা তাদের অনেক গুলি রণতরী পাঠাইল। জাহাজগুলি বিজয়উল্লাসে জাপানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

পৃথিবীর নৌযুদ্ধের ইতিহাসের ২৭শে মে একটী চিরস্মরণীয় দিন। ভোর ৫টার সময় টগো সংবাদ

পাইলেন, যে রুষের রণতরী জাপান ও পুসিমা দ্বীপের মধ্যস্থ প্রণালীর মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। টগো একথা শুনিয়া তাঁহার জাহাজ লইয়া উত্তরদিকে যাত্রা করিলেন, আর অন্যান্য নৌসেনাপতিগণ তাঁহার আদেশ মত দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে রওনা হইলেন। এই সব জাপান রণতরীর সঙ্গে বেলা দশটার সময় রুষ-জাহাজের দেখা হইল। কিন্তু জাপানীরা কোনরূপ যুদ্ধ না করিয়া বিনা তারের টেলিগ্রামে টগোকে এই সংবাদ দিল।

মুকদেনের যুদ্ধ

বেলা দশটার সময় টগো তাঁহার রণতরীগুলি লইয়া উত্তর পশ্চিমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। টগো তাঁহার "মিকাসা" জাহাজে লিখিয়া দিলেন,—

"আজিকার যুদ্ধে সাম্রাজের ভাগ্য পরীক্ষা হইবে, আশা করি প্রত্যেক জাপানীই প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে।" টগো ইসারা করিবামাত্র ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নর রক্তে সমুদ্রের নীল জল লাল হইয়া গেল। আর জাপানীদের অব্যর্থ সন্ধানে এক এক খানি করিয়া রুষিয়ার যুদ্ধের জাহাজ ডুবিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল,

কিন্তু তখনও জাপানীরা ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা মৃত্যুর খেলা খেলিতে লাগিল। এই বিখ্যাত "মুকদেনের" যুদ্ধে রুষিরার সমস্ত রণতরী নষ্ট হইয়া গেল। আহত অবস্থায় রুষ নৌসেনাপতি রুজ্‌বেজ্‌-ভেস্কী বন্দী হইলেন।

সন্ধি-স্থাপন

জাপানীরা সর্ব্বত্র জয়লাভ করিল। এই সময় আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি রুজভেল্ট (Roosevelt) শান্তির জন্য দুই পক্ষকেই অনুরোধ করিলেন। তাঁহার চেষ্টা ও যত্নে ৫ই আগষ্ট তারিখে মেফ্লাওয়ার নামক জাহাজে রুষ ও জাপানের প্রতিনিধি মিলিত হইলেন ও রুষ জাপানের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সন্ধি পোর্টস্‌মাউথের সন্ধি বলিয়া বিখ্যাত। এই সন্ধির ফলে, কোরিয়ায় জাপানের আধিপত্য বজায় রহিল। আর দুই পক্ষই চীনকে মাঞ্চুরিয়া ছাড়িয়া দিল। এইরূপে রুষ জাপানের যুদ্ধ শেষ হইল। এই যুদ্ধে জাপানীরা যে বীরত্ব, যে সাহস ও আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়াছে, তাহা জগতের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে।

ইউরোপ চিরকাল শক্তির উপাসক, ইউরোপের কাছে দুর্ব্বলের কোন স্থান নাই। ইউরোপ যখন দেখিল যে জাপান সমানে সমান যুঝিতে পারে, তার, কামান, বন্দুক, যুদ্ধের জাহাজ সবই আছে তখনই ইউরোপের চক্ষে অসভ্য জাপান সুসভ্য হইয়া উঠিল। আর শত বৎসর ধরিয়া ধর্ম্মের কথা শুনাইয়া বা নীতি উপদেশ দিয়া যাহা না হইত, জাপানীরা এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া একদিনের মধ্যে সে কার্য্য সাধন করিল। জাপানীরা একটা জাতি, তাহাদেরও ইউরোপীয় জাতির মত বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে, তাহারও সম্মানযোগ্য, অন্যায়, ও অপরাধের প্রতিকার করিবার তাহাদেরও অধিকার আছে একথা ইউরোপ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল। শুধু ইহাই নহে, রুষ জাপানের যুদ্ধের ফলে সমস্ত পৃথিবীর রাজনীতির পরিবর্ত্তন ঘটিল। এতদিন পর্য্যন্ত ইউরোপের জাতিগুলি এসিয়াভূমিখণ্ডকে তাহাদের স্বেচ্ছামত বিচরণভূমি বলিয়া মনে করিত, আজ সেই বিশ্বাসে প্রথম আঘাত পড়িল। জাপানের

যুদ্ধ জয়ের পরিণাম

এই জয়ের ফলে সমগ্র এসিয়ার জাগরণ হইল। যেন একটা নবীন জীবনের সাড়ায় সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। চীন তার বহু শতাব্দীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিল। ইউরোপ দেখিল যে আর নিষ্কণ্টকে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া খাইবার আশা নাই।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

বর্ত্তমান জাপান

একটি লোকের জীবদ্দশার মধ্যে একটা জাতি কি করিয়া এত বড় হইল, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। জাপানীদের এই উন্নতির মূলে তাহাদের গভীর স্বদেশ-প্রেম, জাতীয় মঙ্গলার্থে আত্মোৎসর্গের প্রবৃত্তি, আর তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা। জাপানীরা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান লাভ করিবার জন্য যেরূপ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। কিসে জাতীয় মর্য্যাদা, জাতীয় স্বাধীনতা

উন্নতির কারণ

রক্ষা হইবে এই উদ্দেশে জাপানীরা প্রাণপাত করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে লাগিল। জাপান দেখিল এই বিষয়ের জন্যে তাহাকে ইউরোপ ও আমেরিকার শরণ লইতে হইবে। এসিয়ার আর সেই জ্ঞানগরিমা নাই। কিন্তু জাপান প্রথমে ইউরোপ বা আমেরিকার কাছে কোন উৎসাহ পায় নাই, কিন্তু তাহাতেই জাপানীরা নিরস্ত হয় নাই। তাহারা নিজের চেষ্টায় ও উদ্যমে বহুবার ঠকিয়া, বহুবার ভগ্নমনোরথ হইয়া তবে কৃতকার্য্য হইয়াছে। এই তুচ্ছতাচ্ছিল্য জাপানের পক্ষে একপ্রকার মঙ্গলের কারণ হইয়াছিল, কারণ উহাতে জাপানীদের আত্মশক্তি জাগিয়া উঠে। আত্মশক্তি ভিন্ন কোন জাতিই বড় হইতে পারে নাই। কেহ কাহাকেও বাহির হইতে টানিয়া বড় করিতে পারে না। জাপানের সময়ও ইহার অন্যথা হইল না।

জাপানীদের জাতীয় শক্তির অপূর্ব্ব বিকাশের ন্যায় তাহাদের জাতীয় শিক্ষার প্রচারও বিস্ময়কর। পূর্ব্বে জাপানে একমাত্র সামুরাইএরাই লেখা পড়া শিখিত।

আবার সে লেখা পড়া ও অতি সামান্য মাত্র ছিল।

প্রাচীন ও বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী

সামুরাইএরা ভাবিত যে তিনটি জিনিষ শিক্ষা করা উচিৎ, সে হচ্ছে জ্ঞান, বদান্যতা ও সাহস। এই তিনটি যে উচ্চশ্রেণীর গুণ, ও শিক্ষা করা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু জাপানীরা ইহা ছাড়া ও অনেক জিনিষ শিক্ষা করিবার আছে (বিশেষ দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি) তাহা মানিত না। সামুরাইএরা শিখিত তলোয়ার খেলা, তীর ছোঁড়া, ঘোড়ায় চড়া, এক আধটুকু সাহিত্য বা চীনের ভাষা, আর দুই একটি জাপানী কবিতা। কিন্তু এই জ্ঞানে একটা জাতি উঠিতে পারে না। মানুষ জ্ঞানের দ্বারাই বড় হইয়াছে ; জাতিকেও জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু জাপানে ঐ পাঠ প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল। জাপানে তিন প্রকারের স্কুল ছিল 'শো' (Sho) বা ছোট ; 'চিউ' (Chiu) বা মধ্যম, আর দাইগাক্কো (Daigakko) বা বড়। দাইগাক্কো প্রায় দেখা যাইত না। স্কুলগুলি খুবই ছোট ছিল। আর প্রত্যেক শ্রেণীতে ছয়টি বা সাতটির

বেশী ছাত্র ছিল না। শিক্ষার স্থান সারা জাপানে প্রকৃতপক্ষে ছিল দুইটি—কীওটো ও ইডো, বা বর্ত্তমান টোকিও। কীওটো ছিল ধর্ম্মশাস্ত্র ও শিল্প চর্চ্চার স্থান, আর ইডোতে উচ্চশ্রেণীর চীন সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হইত। জাপান জাগিয়া উঠিয়া প্রথমেই তার শিক্ষা প্রণালীর সংস্কার করিল। এখন জাপানে বড় স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সবই হইয়াছে। একমাত্র শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য চারি হাজারের উপরে স্কুল আছে। এই সকল শিল্পবিদ্যালয়ে (Technical school) কৃষি, বাণিজ্য, ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রায় চার হাজারের উর্দ্ধে উচ্চ শিক্ষার বিদ্যালয় আছে। শিক্ষা প্রায় সকল বিষয়ে মাতৃভাষার মধ্য দিয়া দেওয়া হয়। জাপানীরা ইংরাজি, ফরাসী, জার্ম্মান প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করে বটে, কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি, মাতৃভূমির মতন, উহাদের যথেষ্ট টান। প্রায় উচ্চ শিক্ষাই জাপানী ভাষায় দেওয়া হয়। দর্শন বিজ্ঞান সমস্তই তাহারা নিজের ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া লইয়াছে।

জাপানে শিক্ষার আদরও যথেষ্ট। ঐখানে প্রত্যেক

সুস্থ জাপানী যুবককে যেমন অন্ততঃ পক্ষে একটি বৎসর সৈন্যবিভাগে থাকিয়া কুচ কাওয়াজ করিতে হয়, তাহাকে তেমনি খানিকটা লেখা পড়া শিখিতে হয়। জাপানের সম্রাট একবার ঘোষণা করেন, যে কৃষি, শিল্পী, দোকানদার, ব্যবসাদার, স্ত্রীলোক ও শ্রমজীবীর প্রত্যেকের পক্ষেই জীবনে কৃতকার্য্য হইতে হইলে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। জাপানীরা একথার তাৎপর্য্য বোঝে। আমাদের দেশের অনেকে মনে করেন যে ব্যবসা বাণিজ্যে বেশী লেখা পড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু জাপানীরা ও জার্ম্মানরা মনে করে যে ব্যবসার জন্যে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন, ব্যবসায় তাই এখন এই দুইজাতি অগ্রগণ্য।

এই অল্প সময়ের মধ্যের জাপান বাহ্য সম্পদে ইউরোপের ইউরোপীয় জাতির সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

জাপানের বাহ্য-সম্পদ

জাপানের ব্যবসা বাণিজ্য জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। জাপানে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বিদ্যুতের আলো, জলের কল অর্থাৎ যেগুলি বাহ্যসম্পদের প্রধান নিদর্শন, তার কিছুরই অভাব নাই। প্রত্যেক কার্য্যেই

জাপানী সরকারের উৎসাহ ও সহানুভূতি আছে। এই সকল বিষয়ে জাপানীদের অপূর্ব্ব অধ্যবসায়। পূর্ব্বে জাপানীরা বিদেশ হইতে বড় বড় কল কারখানা আনাইত, এখন জাপানেই ঐ সমস্ত তৈয়ারী হয়। জাপানের জাহাজ, জাপানের রণতরী জাপানেই নির্ম্মিত হয়। নিজেদের ব্যবহার্য্য বা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্যে জাপানীদের আজকাল আর সহজে পরের কাছে যাইতে হয় না। প্রায় সকলগুলিই জাপানে প্রস্তুত হয়। ইহা কম উন্নতির কথা নহে।

জাপানীরা যখন পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের আশায় ইউরোপ ও আমেরিকার অনুকরণ করিতে আরম্ভ করে,

জাপানের আধ্যাত্মিকতা

তখন অনেকেই ভাবিয়াছিলেন, যে জাপানীদের নিজস্ব বলিয়া বুঝি কিছুই নাই। জাপানীরা একটা চতুর অনুকরণপ্রিয় জাতি মাত্র হইবে। আর এই অনুকরণ ফলে তাহারা সহজেই অপদার্থ হইয়া পড়িবে, কারণ প্রাণহীন অনুকরণে এ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি বড় হইতে পারে নাই। জাপানীরা কিন্তু কেবল পাশ্চাত্যের অনুকরণে



শিল্প শিক্ষ

জাপান

সাহেব সাজিল না। তাহারা আমেরিকা ও ইউরোপের কেবলমাত্র বাহ্য আচার ব্যবহারের অনুকরণ না করিয়া তাহাদের যে সমস্ত সদ্‌গুণ আছে তাহাই বাছিয়া বাছিয়া গ্রহণ করিতে লাগিল। কেবল পোষাক পরিচ্ছদে সাহেব সাজিলেই যে সাহেব হয় না, জাপানীরা তাহা প্রথম হইতেই বুঝিতে পারিল। বাহ্য-সম্পদের চটকে পড়িয়া তাহারা জাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম বিসর্জ্জন করিল না। জাপানীদের জাতিগত যে একটা সভ্যতা ভব্যতা ছিল তাহা কোনরূপে বিকৃত হইল না। জাপানীরা দেখিল, যে তাহাদের পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জাতীয়তাটুকু বজায় রাখিতে হইবে। তাহাদের সনাতন ধর্ম্ম, প্রাচ্যের সরলতা, কোমলতা, দয়াদাক্ষিণ্য, এইগুলি ছাড়িলে চলিবে না। পাশ্চাত্য জড়বাদ সভ্যতার হস্ত হইতে জাপানীদের রক্ষা করিল, তাহাদের সেই সনাতন আধ্যাত্মিকতা বা ধর্ম্মানুরাগ। জাপানীদের এই আধ্যাত্মিকতা "বোসিদো" (Bushido) নামে খ্যাত। এই বোসিদো বা সনাতন আধ্যাত্মিক আদর্শ জাপানী

জাতির মেরুদণ্ড, তাহাদের জাতীয় শক্তির মূলকেন্দ্র। পাশ্চাত্য জড়বাদ সভ্যতা মানুষকে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জন সাধারণকে বিলাস-প্রিয়, অর্থলোভী ও স্বার্থপর করিয়া তোলে, যেন নিজের জীবনের অপেক্ষা কোন প্রিয় পদার্থ নাই। আর জাপানীদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শ শিক্ষা দিতেছে যে বিলাস অপেক্ষা দরিদ্রতা শ্রেষ্ঠ, কেননা ভোগবিলাসে মানুষকে অপদার্থ করিয়া ফেলে। "বোসিদো" জাপানীকে শিক্ষা দিতেছে, যে নৈতিক উন্নতি বাহ্যসম্পদ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। 'বোসিদো' বলিতেছে, জীবনে ধৈর্য্য, বীর্য্য, সাহস ও ত্যাগস্বীকার চাই, আর সকল সময়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ, সামাজিক, জাতীয় বা পারিবারিক মঙ্গলের জন্য বলি দিতে হইবে। বোসিদো জাপানীকে শিক্ষা দিতেছে, যে বিন্দুমাত্র অপমান বা হীনতা স্বীকার করার অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেষ্ঠ। 'বোসিদো' বলিতেছে, শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে। 'বোসিদো' চায় জীবনে কষ্ট সহিষ্ণুতা, বীরত্ব, সাহস, নির্ভীকতা, আর মৃত্যুর

প্রতি একান্ত উপেক্ষা। মৃত্যুর ভয়ে জড়সড় হইয়া, যত লাঞ্ছনাই হউক না কেন, কোন রকমে বাঁচিয়া থাকা যে সনাতন আধ্যাত্মিক আদর্শ—'বোসিদো' তাহা স্বীকার করে না। এই আদর্শের ফলে জাপানীরা নির্ভীক, কষ্ট সহিষ্ণু, পরিশ্রমী ও দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা হইয়াছে। 'বোসিদো' চায় শারীরিক বল, নৈতিক উন্নতি, আর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা, —ইহাদের মধ্যে একটী ছাড়িলেও চলিবে না। জাপানীরা দেখাইল যে পাশ্চাত্যের সব দোষগুলি গ্রহণ না করিয়াও পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সভ্যতা গ্রহণ করা যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংমিশ্রণের ফল বর্ত্তমান জাপান। জাপান দেখাইল যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে মিশ খাইতে পারে।

একতা ও স্বদেশপ্রেম

এই জাপানীদের দেশানুরাগ শিখিবার বিষয়। জাপানীরা নিজের জাতি ও দেশকে এত ভালবাসে, যে জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যে তাহারা সর্ব্বদা মরিতে প্রস্তুত। জাপানীরা মনে করে, সমস্ত জাপানটি একটি বৃহৎ পরিবার, আর প্রত্যেকেই সেই পরিবারভুক্ত, আর এই পারিবারিক সুখ দুঃখে সকলেই সমান ভাবে জড়িত। তাই যেখানেই

যে জাপানী থাকুক না কেন, দেশের জন্যে প্রত্যেকেই যতটুকু সাধ্য করে। বিগত রুষ জাপানের যুদ্ধে প্রত্যেক জাপানী বালক শৈশবাবধি দেশের গৌরব, দেশের ইতিহাস ভালবাসিতে শিখে। তাহাকে শৈশবাবধি শিক্ষা দেওয়া হয়, যে মাতৃভূমির জন্য, আবশ্যক হইলে, তাহাকে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে হইবে। রুষিয়ার সেনাপতি ক্রুপাট্‌কিন এ বিষয়ে বলিয়াছেন, যে বহু বৎসর ধরিয়া জাপানীদের এই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, যে জাপান অজেয়, আর প্রত্যেক জাপানীকেই বীর হইতে হইবে, ইহার ফলে প্রত্যেক জাপানী আপনার দেশকে প্রাণের মতন ভাল বাসিতে শিখিয়াছে ও রণনৈপুণ্য লাভ করিয়াছে। শিক্ষা সব সময়েই জাতীয়তার দিক দিয়া দেওয়া হয়। ইহাই জাপানের অপূর্ব্ব উন্নতির গূঢ় কারণ। এই কথাগুলি জাপানীর শত্রু পক্ষের উক্তি। এখন বুঝিলে জাপানীরা কিসে এত অল্পদিনের মধ্যে এত উন্নতি করিয়াছে।

উপসংহার

পরমেশ্বর মানুষকে, এবং কখনও কখনও এক একটি জাতিকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন। আর সে পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয় সেই বড় হয়। রুষ জাপানের যুদ্ধে জাপানের আত্মশক্তির পরীক্ষা হয়, আর সেই অগ্নি পরীক্ষায় জাপান জয় লাভ করে।

রুষ জাপানের যুদ্ধের পর জাপানের শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে আর কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। সেই দিন হইতে জাপানীরা সভ্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯১৪ সালের ইউরোপীয় মহাসমরে জাপান ইংরাজদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া জার্ম্মান উপনিবেশ সিংটাও (কিয়াচ়) দখল করে। ১৯১০ সালে জাপানীরা, তাদের বহুকালের দাবাদাওয়ার ফল কোরিয়া জাপান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইল।

জাপান শক্তি

ইহার দুই বৎসর পরে লোকহিতৈষী প্রজাবৎসল জাপান সম্রাট টোকিও সহরে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইনি জাপানীদের সর্ব্বপ্রথম রাজা জীমু হইতে ১২১ পুরুষ।

রাজার মৃত্যু

সম্রাটের মৃত্যুতে প্রত্যেক জাপানীই মর্ম্মাহত হইল। এই শোকে, প্রবীণ সেনাপতি, নগী সস্ত্রীক আত্মহত্যা করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজার প্রতি এইরূপ ভক্তি ভালবাসা ইতিহাসে অতি বিরল।

আজ জাপানের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন। এসিয়ায় জাপানীদের সমকক্ষ কেহ নাই। পাশ্চাত্য জগতেও ইংলণ্ড, ফ্রান্স জার্ম্মানী ও আমেরিকা ভিন্ন জাপানের সঙ্গে আর কাহারও তুলনা হয় না। পৃথিবীর বড় বড় বন্দরে জাপানী জাহাজ। বড় বড় সহরে জাপানী বণিক। দোকানে দোকানে জাপানী দ্রব্য। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানী ছাত্র। আর দূর দূরান্তরের সাগর বক্ষে জাপানের রণতরী, জাপানীদের শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় দিতেছে।

আর জাপানে গিয়া দেখ। তার চারি দিকে একটি উন্নতির ঢেউ উঠিয়াছে। কত বড় বড় কল কারখানা। কত সুন্দর সুন্দর দোকানপাট। কত বড় বড় স্কুল কলেজ। কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা। কত বিচিত্র কারুকার্য্যশোভিত বাড়ী, প্রমোদ উদ্যান, নাচঘর,

থিয়েটার, স্নানাগার। বড় বড় সহরে স্কুল কলেজ, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা সবই আছে। তার সুন্দর বন্দর, দুর্ভেদ্য দুর্গ, সমৃদ্ধিশালী সহর ও ছবির মত গ্রামগুলি দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। আর ইহার উপর জাপানীদের পোষাক পরিচ্ছদ, আসবাব, বিলাস বৈভব দেখিবার জিনিষ। কেহ কেহ জাপানীদের এসিয়ার ইয়াংকী বা আমেরিকাবাসী, কেহ কেহ বা পূর্ব্বদেশের ফরাসী এই আখ্যা দিয়া থাকেন। জাপানের সৈন্য, জাপানের রণতরী, জাপানের সেনাপতি ইউরোপের ঈর্ষাস্থল। আর জাপানের ব্যবসা বাণিজ্য সর্ব্বত্র বিস্তৃত। আজ দোকানে দোকানে জাপানী শিল্প, জাপানী চিত্র, জাপানী দ্রব্য। ভারতের সর্ব্বত্র জাপানী জিনিষ।

প্রতিবৎসর ভারতবর্ষ হইতে দলে দলে ছাত্র জাপানে শিল্প বিজ্ঞান শিখিতে যায়। আর একদিন জাপানীরাই জ্ঞানালোকের জন্য ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতের দিকে চাহিয়া থাকিত।

সমাপ্ত।

পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে

প্রকাশিত হইয়াছে

১। বৈদিক ভারত

২। ইংলণ্ড

৩। গ্রীস

৪। জাপান

৫। ব্রহ্মদেশ

৬। পারস্য

৭। রোম

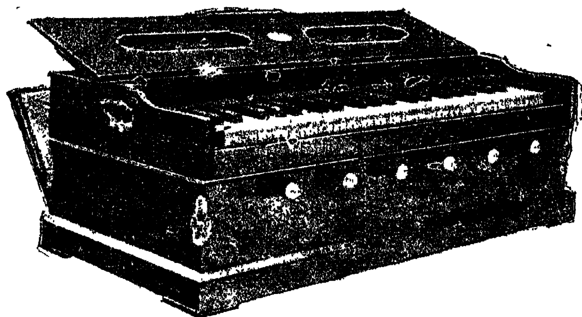
৮। চীন

৯। মিশর

১০। জার্ম্মেণী



রুবী ফ্লুট হারমনিয়ম



ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের শিক্ষার উপযোগী উৎকৃষ্ট হারমোনিয়ম।

সেগুণ কাষ্ঠের ও বিলাতী চামরড়ার তৈয়ারী—বিশেষ মজবুত।

৩ অক্টেভ, ৪ স্টপ, ১ সেট উৎকৃষ্ট রিড। অতি উত্তম কারুকার্য্য এবং সুমিষ্ট স্বরযুক্ত বাক্স সহ মূল্য ৩০৲ টাকা।

এম্, এস্, সাহা

বীণা, অরগ্যান ও হারমোনিয়ম নির্ম্মেতা।

৫।১ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পল্লীগ্রামে, অগণিত ব্যক্তি কত কষ্টভোগ করিতেছে, অনেকে অকালে জীবন হারাইতেছে, কত লোক উপর্য্যুপরি ম্যালেরিয়া আক্রমণে জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় জীবন্মৃত হইয়া প্রাণধারণ করিয়া আছে মাত্র :—

সেই কারণ অনেক দিন যাবৎ এই ভয়ানক জ্বররোগের একটি উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ মহোপকারী ঔষধ আবিষ্কার করাইবার চেষ্টায় থাকিয়া অবশেষে আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি।

কয়েক বৎসর ধরিয়া অসংখ্য নানাভাবের জ্বরগ্রস্থ রোগীদিগকে এই মহৌষধ সেবন করাইয়া চূড়ান্ত পরীক্ষা লওয়া হইয়াছে।

মফস্বলের সকল প্রধান স্থানে, বিশেষতঃ যথায় ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ অধিক, তথায় এই মহৌষধ বিক্রয়ার্থ রাখিবার বিপুল আয়োজন করা গিয়াছে।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হইতে এজেণ্ট লইব।

পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

মূল্য ছোট বোতল ১৲ ও বড় বোতল ১৷৹ দেড় টাকা।
„ ডাঃ মাঃ ।৶৹ আনা। „ ডাঃ মাঃ ৸৶৹ আনা।

এই মহৌষধ

প্রত্যহ শতাবধি রোগীকে আমাদিগের ৭৭ নং বেণিয়াটোলাস্থ বাটী হইতে বিতরণ করিয়া আসিতেছি। এতদ্ব্যতীত আমাদিগের ঘুঘুডাঙ্গার বাগান বাটী হইতে অসংখ্য রোগীকে প্রতি রবিবার ঔষধ বিতরণ করা যাইতেছে।

ঔষধের ফলাফল দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল।

অত্যল্পকাল মধ্যে আমাদিগের এই মহৌষধ

ভারতের প্রায় সর্ব্বস্থানে আদরের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা অপেক্ষা ঔষধের আর কি উৎকৃষ্ট পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে।

মফঃস্বল হইতে প্রতিনিয়ত ভূরি ভূরি প্রশংসাপত্র ও আরোগ্য সমাচার আসিতেছে।

শিশুতোষ সিরিজ

সম্পাদক—শ্রীশিশির কুমার মিত্র বি, এ।

আশ্বিন ১৩২৭ হইতে প্রতি মাসে একখানি করিয়া প্রকাশিত হইতেছে।

প্রত্যেক বই-তে অনেকগুলি করিয়া ছবি আছে। মোটা এণ্টিকে, র বেরঙের কালিতে ছাপা।

সডাক বার্ষিক মূল্য ৪৲ ষাণ্মাষিক মূল্য ২৲, প্রতি সংখ্যা ।৵০

১। পৃথিবীর জন্ম
২। প্রকৃতির পরাভব
৩। কানুর কীর্ত্তি
৪। আর্য্য ও অনার্য্য
৫। আজগুবি জন্মকথা
৬। ছেলেদের বিষ্ণুপুরাণ
৭। গল্পে রামকৃষ্ণ
৮। সত্যযুগের কথা
৯। উদোলবুড়োর সাঁওতালি গল্প
১০। রামকৃষ্ণের আরো গল্প
১১। সতী
১২। উদোলবুড়োর আরো গল্প
১৩। বাপ্পাবীর
১৪। পৌরাণিক জন্মকথা
১৫। মহম্মদ মহসীন
১৬। কর্ম্মদেবী
১৭। মজার গল্প
১৮। ভীষ্ম
১৯। রামকৃষ্ণের নূতন গল্প
২০। জাতকের গল্প
২১। হামির
২২। রামকৃষ্ণের দেদার গল্প
২৩। ঠাকুরদের গল্প
২৪। ভাই ভাই
২৫। কালিদাসের আজব গল্প
২৬। ডাইনি মাসী
২৭। রাজকন্যা
২৮। চণ্ড
২৯। আজব গল্প
৩০। স্বপ্নপুরী
৩১। রাণা কুম্ভ
৩২। রাজপুত্র

শিশির পাবলিশিং হাউস,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

আমার দেশ

ছেলে মেয়েদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র

সডাক বার্ষিক মূল্য ৩৲, ষাণ্মাসিক মূল্য ১॥০,

প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা।

সম্পাদক—

শ্রীশিশির কুমার মিত্র, বি, এ,

১লা মাঘ ১৩২৭ সাল হইতে প্রতি মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হইতেছে।

উদ্দেশ্য—

ছেলে মেয়েদের—নৈতিক উন্নতি সাধন

ছেলে মেয়েদের—চরিত্র গঠন

ছেলে মেয়েদের—মনে দেশাত্মবোধ জন্মাইয়া দেওয়া

ছেলে মেয়েদের—আত্মবিশ্বাসী করিয়া তোলা

ছেলে মেয়েদের—দেশ বিদেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দেওয়া

আমার দেশে

প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও ছবি প্রভৃতির অফুরন্ত আয়োজন।

ছেলে মেয়েদের জন্য

এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মাসিক পত্র ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত আর একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। প্রতি মাসে দুইখানি করিয়া রঙিন ছবি ও ২০।২৫ খানি একরঙা ছবি থাকে। হাসির গল্প, ছড়া, বৈজ্ঞানিক গল্প, ধাঁধাঁ ও প্রবন্ধে ৫০ পৃষ্ঠার উপর লেখা থাকে।

'আমার দেশের' গ্রাহক না হইলে আপনার ছেলে মেয়েদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

আজই গ্রাহক হউন।

শিশির পাবলিশিং হাউস,
কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা।